মার্চ ২০১৮ ❑ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৪

# নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

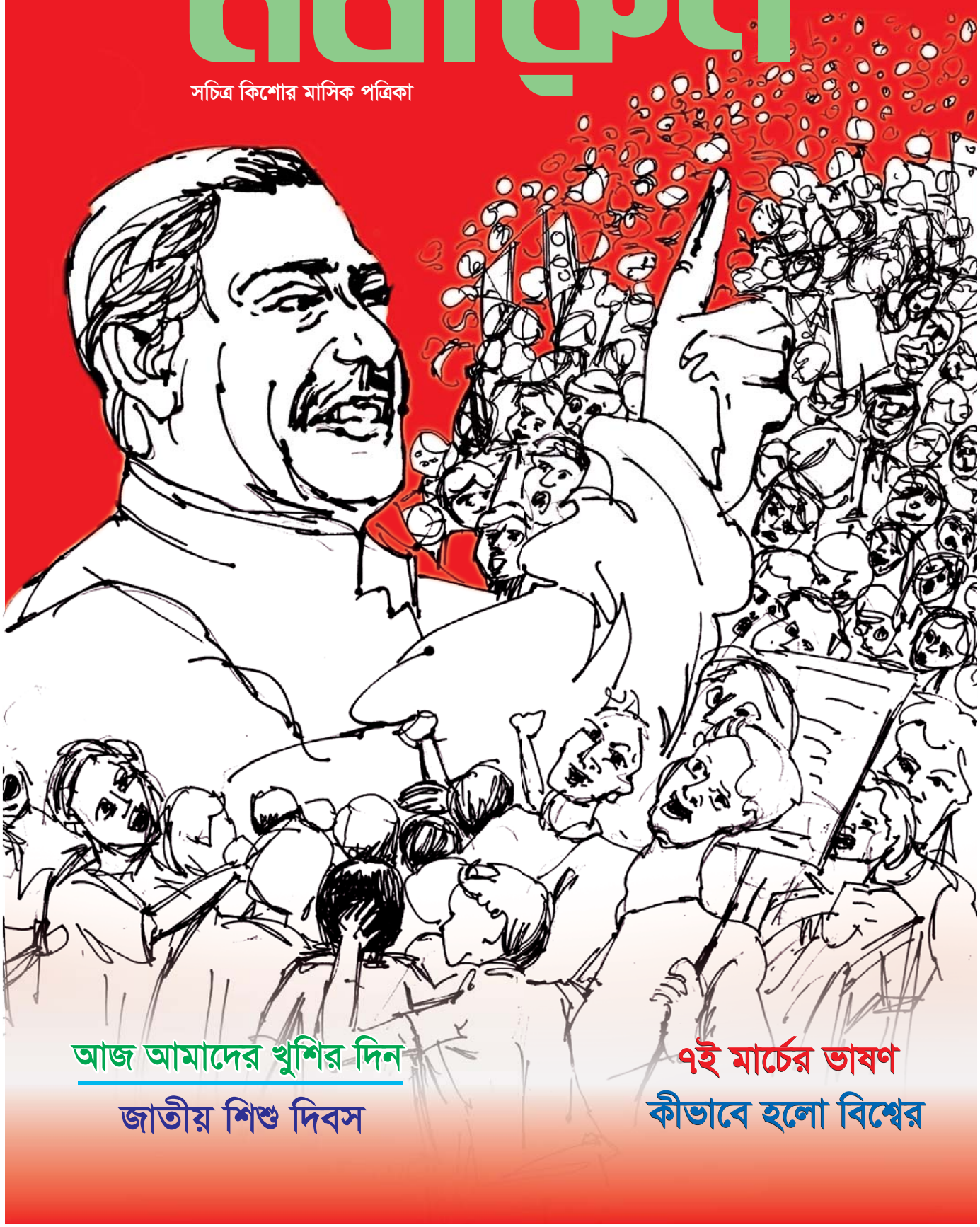

আজ আমাদের খুশির দিন

জাতীয় শিশু দিবস

৭ই মার্চের ভাষণ

কীভাবে হলো বিশ্বের

*চৈতী গাঙ্গুলী, পঞ্চম শ্রেণি, সৃজন বিদ্যাপীঠ, সুনামগঞ্জ*

# শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ৭

## কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য

### শেখ হাসিনার অবদান
### কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ

দেশের সকল মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে শেখ হাসিনার সরকার বদ্ধ পরিকর। তাইতো প্রতি ৬,০০০ মানুষের জন্য গড়ে তুলেছেন একটি কমিউনিটি ক্লিনিক।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবাসহ সকল জনগণের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাই এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। সারাদেশে প্রায় ১৩,১৩৬ টি (জুন ২০১৬) কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ছাড়া জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে উন্নততর চিকিৎসার জন্য তাদের উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রেরণের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সাধারণ রোগের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে।

প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যুর হার ৪১ থেকে ৩৭-এ নামিয়ে আনা এবং প্রতি লাখে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৪ থেকে ১০৫-এ নামিয়ে আনা।

১২ মাসের নিচের শিশুদের শতভাগ টিকাদান কর্মসূচির আওতায় আনা।

গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচির আওতায় শিশুদের দিবাকালীন সেবা প্রদানসহ আরো অনেক কার্যক্রম।

*প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম*

Regd, Dha, 143-Monthly Nabarun, Vol-42, No- 9, March 2018, Tk-20.00

# তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ

বাংলা সনের শেষ মাস চৈত্র। আমের মুকুলের গন্ধ আর গরম হাওয়া নিয়ে এসেছে চৈত্র মাস। এ মাসের শেষ দিনটিকে বলা হয় 'চৈত্র সংক্রান্তি'। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে পালন করা হয় নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ ও মেলা।

বন্ধুরা, বাংলা বছরের শেষ মাসে তোমাদের একটি ইতিবাচক অর্জনের কথা বলি। তোমরা তো জানোই, আমাদের দেশ এখন খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ। সেই সাথে পর্যাপ্ত মাছ ও মাংস উৎপাদনেও এখন আমরা স্বয়সম্পূর্ণ হয়েছি।

দেশে বর্তমানে দৈনিক মাথাপিছু মাংসের প্রাপ্যতা ১২১ দশমিক ৭৪ গ্রাম, যা চাহিদার তুলনায় বেশি। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৭১ লাখ ৩৫ হাজার টন মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭১ লাখ ৫৪ হাজার টন উৎপাদিত হয়েছে। মাছ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০ লাখ ৫০ হাজার টন। আর উৎপাদন হয়েছে ৪১ লাখ ৩৪ হাজার টন।

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই মাছ, মাংস খেতে খুব পছন্দ করো। মাছ ও মাংসে রয়েছে অনেক পুষ্টি উপাদান। আর এ সকল উপাদানগুলো আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। তবে মাংস খাওয়ার সময় খেয়াল রাখবে যেন তা অতিরিক্ত না হয়ে যায়।

*প্রতিবেদন : সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি*

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা

# সম্পাদকীয়

লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি অমূল্য স্বাধীনতা। কীভাবে, তোমরা ভালো করেই জানো। আর তাই তো তোমাদের মতো নবারুণের কিছু খুদে বন্ধু বড়োদের কাছ থেকে শুনে রংতুলিতে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। ছবিগুলো খুঁজে পাবে পুরো নবারুণ জুড়ে।

জানো তো, ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৭ সুনামগঞ্জের ঐতিহ্য জাদুঘর প্রাঙ্গণে নবারুণ মোবাইল অ্যাপ উদ্‌বোধন করা হয়েছিল। সেখানে এসেছিল এই বন্ধুরা।

ওদের মতো তোমরাও নিশ্চয়ই জানো, মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহবান জানিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ এখন বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ, বিশ্বের সম্পদ।

১৭ই মার্চ এই প্রিয় নেতার জন্মদিন জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। মন খুলে আনন্দ করো। কেননা, এই স্বাধীন দেশ তিনি উপহার দিয়েছিলেন কেবল তুমি এবং তোমরা নির্ভয়ে আনন্দ করবে বলে।

২৬শে মার্চ আমরা উদ্‌যাপন করছি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হিসেবে।


**প্রধান সম্পাদক**
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

**সিনিয়র সম্পাদক**
মোঃ এনামুল কবীর

**সম্পাদক**
নাসরীন জাহান লিপি

**সহ-সম্পাদক**
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

**সম্পাদকীয় সহযোগী**
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

**মূল্য : ২০.০০ টাকা**

*প্রতিভা দাশ, তৃতীয় শ্রেণি, আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতন, সুনামগঞ্জ*

## কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?

**মিনার মনসুর**

শত বছরেও ম্লান হবে না ৭ই মার্চে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণটির উজ্জ্বলতা। আমাদের ইতিহাসের এক দুর্লভ হীরকখণ্ড এটি। পড়ো পৃষ্ঠা ৫

## ৭ই মার্চের ভাষণ কীভাবে হলো বিশ্বের

**ফারহানা আহমেদ চৌধুরী**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চ-এর ভাষণ ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে এই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিল বিশ্ব মানবতা। পড়ো পৃষ্ঠা ১৪

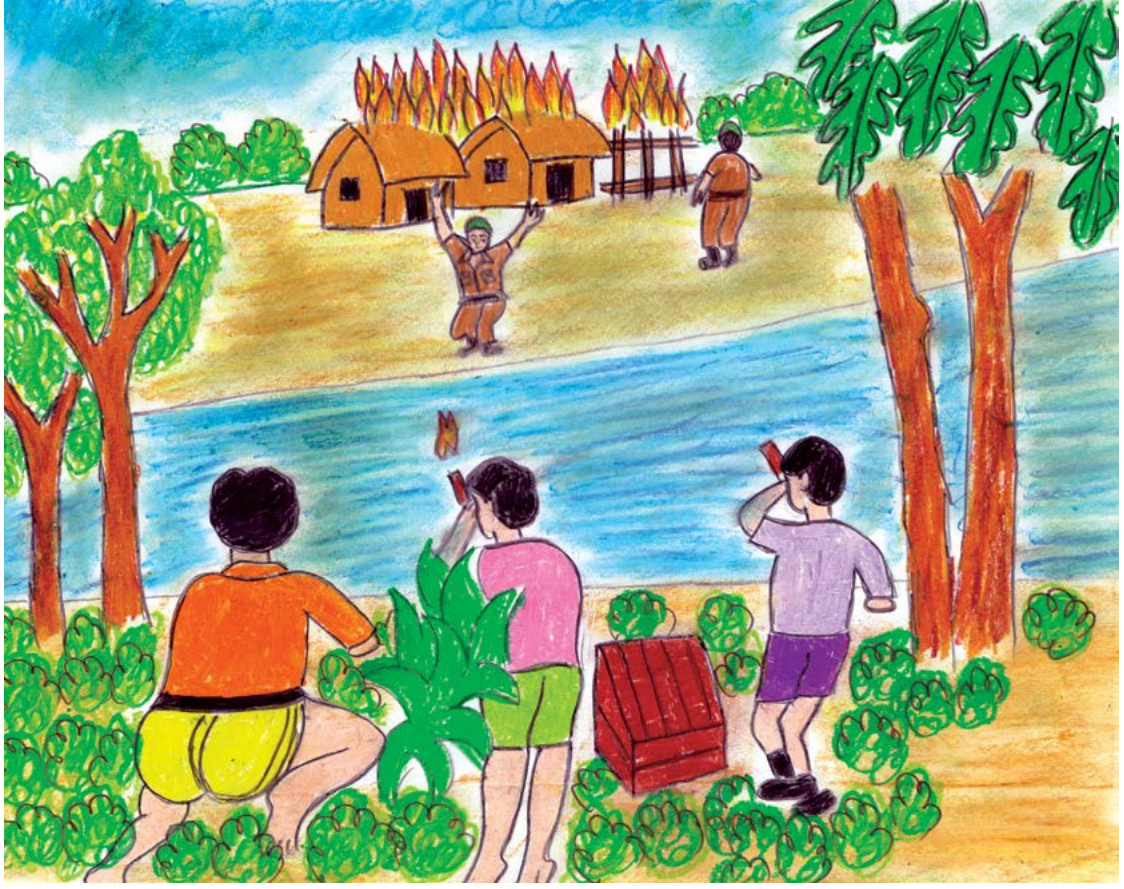

দেবশ্রী দে, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি এস.সি. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ

## আজ আমাদের খুশির দিন

**জুনায়েদ তৌহিদ**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ই মার্চ। তাঁর হাত ধরেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। আনন্দের এই দিনটি পালিত হচ্ছে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে। সে উপলক্ষে খুদে বন্ধু লিখেছে চমৎকার কবিতা। পড়ো পৃষ্ঠা ১৩

## বাংলাদেশের সংবিধান

**নূহ আব্দুল্লাহ**

নিজেদের ভালো, দেশের ভালোর জন্য আমাদের সংবিধান জানা খুব প্রয়োজন। পড়ো পৃষ্ঠা ৩৭

**শিল্প নির্দেশক**
সঞ্জীব কুমার সরকার

**সহযোগী শিল্প নির্দেশক**
সুবর্ণা শীল

**অলংকরণ**
নাহ্‌রীন সুলতানা

**যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা**
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

**বিক্রয় ও বিতরণ**
**সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

**মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০**

# সূচি

## নিবন্ধ


২০ আমার দেখা ৭ই মার্চ/ ডা. নূরল হক
২২ ৭ই মার্চ নিয়ে ডিএফপি'র তথ্যচিত্র/ মেজবাউল হক
২৩ উন্নয়নশীল দেশের পথে বাংলাদেশ/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৮ ছোটোদের আয়োজনে চলচ্চিত্র উৎসব/ নাবীল অনুসূর্য


## গল্প


২৭ বাটা ভরা রহস্য/ শরীফ খান
৩৬ আর নেব না আড়ি/ রেবেকা ইসলাম
৪০ স্বপ্নবানের দেশে/ ম্যারিনা নাসরীন
৪৫ দুই ভাই/ মিলন বনিক
৫৩ মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি/ আবুল কালাম আজাদ
৬০ প্রশ্ন ফাঁস/ কবির কাঞ্চন


## এক ঝাঁক কবিতা


৮ ওয়াসিফ-এ-খোদা/ তানভীর হোসেন চৌধুরী
৯ ইফতেখার হালিম/ পীযূষ কান্তি বড়ুয়া
১০ দেলোয়ার হোসেন/ মো. রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত
সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী অন্যা
১১ ইমরান পরশ/ জসীম আল ফাহিম/ এইচ এস সরোয়ারদী
১২ চন্দ্রশিলা ছন্দা/ তাহরিমা আলম কেয়া/ শেখ দুলাল
মেশকাউল জান্নাত বীথি
২২ প্রজ্ঞা জ্যোতি দে


## সাক্ষাৎকার


২৫ ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ: শিশুসাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র
শাহানা আফরোজ


## আঁকা ছবি


১ প্রতিভা দাশ
২ দেবশ্রী দে
৩ ইসরাত জাহান মুন
৪ কাইও কালদেরা
৮ মোসা. মহ্তাসিম জারিফ
৯ এইস. এম. রাজ
১০ হৈমন্তী বর্মণ পূজা
১১ তপশ্রী চৌধুরী
১২ অম্লান
৪৯ ফারজানা আক্তার শিমলা
৫০ প্লাবন দাস
৫১ প্রজ্জল চৌধুরী
৫২ ছাকিবুল ইসলাম (ইমন)/ আহিয়া মজুমদার
২য় কভার: চৈতী গাঙ্গুলী


## ছোটোদের লেখা


৪৯ তোমরা আমাদের অহংকার/ আনিকা রহমান (বৃন্ত)
৫০ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ/ সামিয়া ইসলাম রিমি
৫১ একটি মুক্তিযুদ্ধের গল্প/ মাহিরা মারজিয়া
৫১ ৭ মার্চ / ওমাইরা আলম টাইফ
৫২ আমার দেশ বাংলাদেশ/ নারিসা তাবাসসুম


## প্রতিবেদন


৬২ বইমেলায় 'কিশলয়' চমক! / জান্নাতে রোজী
৬৪ ঋতু পরিবর্তনে অসুখবিসুখ/ জামাল উদ্দিন
৬৫ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ/ সুলতানা বেগম
৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ / সাদিয়া ইফ্ফাত আঁখি

*ইসরাত জাহান মুন, চতুর্থ শ্রেণি, আদর্শ শিশু শিক্ষা নিকেতন, সুনামগঞ্জ*

*বাংলাদেশ আর ব্রাজিলের বন্ধুত্বের ছবিটি এঁকেছে ব্রাজিলের শিশু কাইও কালদেরা। ও পড়ে ব্রাজিলের জাহদিম দা ইনফান্সিয়া স্কুলের ১ম শ্রেণিতে।*

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www. dfp.gov.bd এর প্রকাশনা অংশ থেকে পুরো পত্রিকাটি ডাউনলোড করে পড়ো। এছাড়া নবারুণ-এর ফেসবুক পাতা থেকে (facebook. com/ nobarunpotrikabd) তো আছেই।

*ঠিকানা: স্কাউট ভবন, উপজেলা চত্বর, গংগাচড়া, রংপুর। নবারুণ পত্রিকা প্রতি মাসে কত তারিখে প্রকাশিত হয় তা জানাতে আপনার মর্জি হয়।*

**প্রিয় জিনিয়া,** তোমার ঠিকানায় নিয়মিত পৌঁছে যাবে নবারুণ। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের ভেতর প্রকাশের জোর চেষ্টা থাকে নবারুণ-এর।

## নবারুণ-এর ফেসবুক পাতায়

**R.i. Shamim**

'নবারুণ মোবাইল অ্যাপ' ডাউনলোড করে পাশের ছবিটি পাঠিয়ে জিতে নিয়েছেন পুরস্কার। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সন্তান মোবাইলেই পড়ে ফেলতে পারছে নবারুণ। এতে আপনি খুশি তো?

নবারুণ-এর ফেসবুক পাতায় Amanullah Aman লিখেছেন, ইনস্টল করেছি। ধন্যবাদ নবারুণকে আমার কষ্ট দূর করার জন্য। এখন অ্যাপসেই নবারুণ পড়ি আমি।

*জনাব, আমি জান্নাতুল ফেরদৌস জিনিয়া, গংগাচড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। আমি নবারুণ পত্রিকার ষান্মাষিক গ্রাহক হওয়ার জন্য একশত বিশ টাকা মানি অর্ডার করেছি। মানি অর্ডার নং: ২০৯৬. আশা করি আগামী মাস থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নিম্নোক্ত ঠিকানায় নবারুণ পত্রিকা পেয়ে যাব।*

একুশে বইমেলায় স্টল নম্বর ৮৫-৮৬ ঘুরতে গেলেই দেখা হয়েছে বেহালাবাদক নবারুণ-রোবটের সাথে। নবারুণ-রোবটের সাথে তোলা বন্ধুদের ছবি দেখে খুব ভালো লাগছে, তাই না?

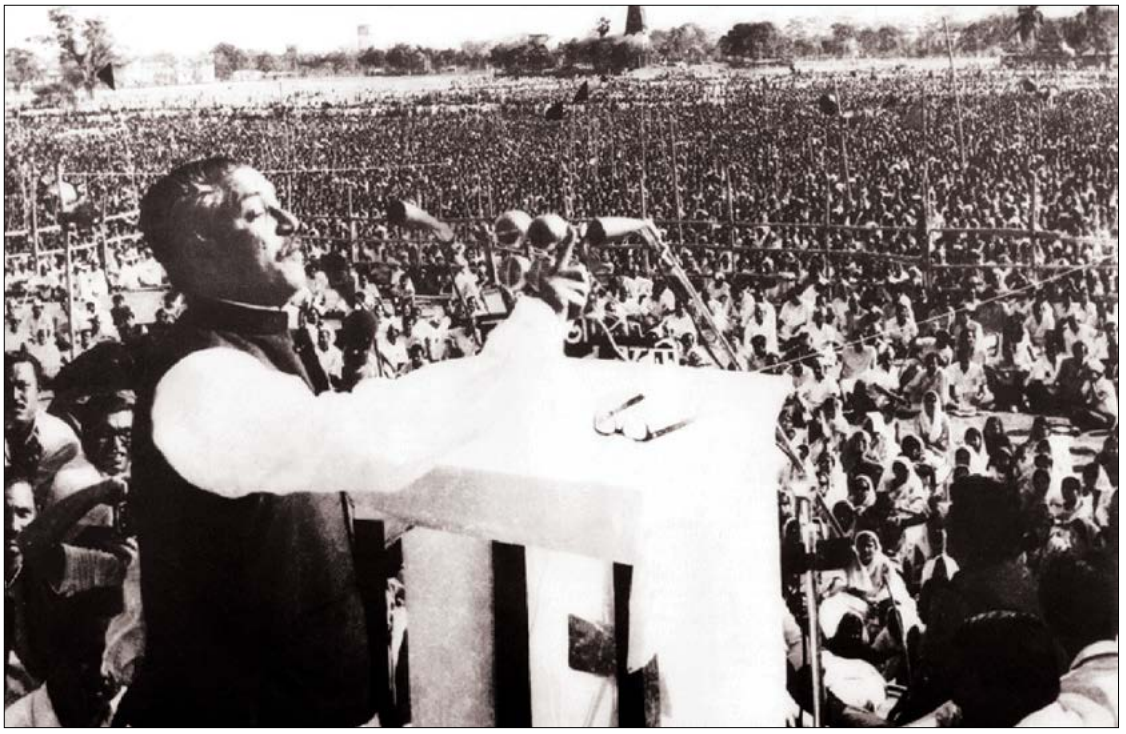

“
এবারের সংগ্রাম
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম
”

# কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?

## মিনার মনসুর

যে-কোনো বিবেচনায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে স্থান করে নিতে পারে। সেই ভাষণের পর ৪২ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু কোনো মলিনতাই স্পর্শ করতে পারেনি তাকে। পারবেও না। স্বাধীনতা বিরোধীরা যতই লাফালাফি করুক এবং যত ইচ্ছা ছুঁড়ে দিক কাদা– শত বছরেও ম্লান হবে না ভাষণটির উজ্জ্বলতা। কারণ আমাদের ইতিহাসের এক দুর্লভ হীরকখণ্ড এটি। এর ঔজ্জ্বল্য চিরকালীন।

রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রের সেই ভাষণই যে নির্ধারণ করে দিয়েছিল বাংলাদেশের ভাগ্য– তা কে অস্বীকার করবে? একাত্তরের মার্চে সেই ভাষণ শুনে রক্ত টগবগ করেনি এমন বঙ্গসন্তান কে আছে? প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো কী অসাধারণ সেই আবেগ। আবার কী অসামান্য নিয়ন্ত্রণ সেই আবেগের ওপর। টান টান উত্তেজনা নিয়ে সামনে বসে আছে লাখ লাখ মানুষ। আর সামনে না থেকেও টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত কান পেতে আছে আরো কয়েক কোটি মানুষ। কান পেতে আছে পাকিস্তানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সমরনায়ক ইয়াহিয়া খান এবং তার রক্তপিপাসু হায়েনার দল। পান থেকে চুন খসলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছিঁড়ে তছনছ করে দেবে সবকিছু।

কল্পনা করুন কী ভয়ংকর একটি মুহূর্ত। সারা দেশের মানুষ তাদের নেতার মুখ থেকে সবচেয়ে কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ কথাটি শুনতে চায়। মারাত্মক সেই কথাটির নাম– স্বাধীনতা। তার চেয়ে কম কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না সদ্যজাগ্রত এই গণদেবতা। কিন্তু নেতা তো জানেন এই ঘোষণার অর্থ কী। এর একটাই অর্থ। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাস করে সেই রাষ্ট্রটিকেই ভেঙে ফেলার ঘোষণা দেওয়া। তার মানে তো খুবই স্পষ্ট– রাষ্ট্রদ্রোহিতা। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা তো এই সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই একটি ভাষণের ওপর তখন বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ। অগ্নিপরীক্ষাই বটে! খুব কম নেতার জীবনেই এমন অসাধারণ মুহূর্ত আসে।

## দুই

এর পরের ঘটনা বর্ণনা করা কঠিন। লাখ লাখ মানুষের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে যা ঘটে গেল আরো কঠিন সেটা বিশ্বাস করা। সেই দৃশ্য দেখার এবং সেই ভাষণ শোনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে তারা আজও নিজের চোখ-কানকে বিশ্বাস করতে পারেন না। সত্যিই কি সেদিন বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণটি দিয়েছিলেন? সত্যিই কি তারা তা নিজের কানে শুনেছেন? নাকি সব দিবাস্বপ্ন? সাদা পাঞ্জাবি আর কালো 'মুজিব' কোট পরিহিত বঙ্গবন্ধুর সেই অপরূপ দেহভঙ্গি সত্যিই কি তারা দেখেছেন? যাকে তারা দেখেছেন তিনি কি সত্যিই তাদের নেতা শেখ মুজিব বা 'মুজিব ভাই' বা বঙ্গবন্ধু, নাকি কোনো দেবদূত? এ রকম বিপজ্জনক একটি সময়ে এমন অসাধারণ একটি ভাষণ কি কোনো মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব? এই সংশয় নিয়ে এখনো এ দেশে বেঁচে আছেন বহু মানুষ এবং এই মধুর আচ্ছন্নতার মধ্যেই তারা কাটিয়ে দিতে চান তাদের বাকি জীবন। কারণ ব্যক্তি মানুষের জীবনে তো বটেই, এমনকি জাতির জীবনেও এ ধরনের মুহূর্ত খুব কমই আসে।

বিশাল একটি জনসমুদ্র মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন সেই ভাষণ। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে এমনভাবে তারা একাত্ম হয়ে গেলেন যেন রেসকোর্সে সমবেত লাখো মানুষের একটি দেহ, একটিই প্রাণ। তারা যা চেয়েছিল প্রাপ্তি যেন তার চেয়েও বেশি। থেমে থেমে জনসমুদ্রের সেই অভূতপূর্ব গর্জন যেন সেটাই জানিয়ে দিচ্ছিল বিশ্ববাসীকে। গণদেবতা যা চেয়েছিল সবই বলে

**বিশাল একটি জনসমুদ্র মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলেন সেই ভাষণ। বক্তৃতার প্রতিটি শব্দের সঙ্গে এমনভাবে তারা একাত্ম হয়ে গেলেন যেন রেসকোর্সে সমবেত লাখো মানুষের একটি দেহ, একটিই প্রাণ।**

দিয়েছেন নেতা। কিন্তু পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বা আইনি কাঠামোকে লঙ্ঘন করেননি কোথাও। প্রতিটি শব্দই সুচিন্তিত, সুনির্বাচিত। অথচ কোথাও কোনো ছন্দপতন নেই। সামান্যতম দ্বিধাও নেই সেখানে। জনসম্পৃক্ততা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার এমন সমন্বয় শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বেও বিরল।

## তিন

*'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'* শিরোনামের অসামান্য এক কবিতায় কবি নির্মলেন্দু গুণ শব্দ দিয়ে একাত্তরের ৭ই মার্চের অনন্যসাধারণ সেই ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছেন। বলতে দ্বিধা

নেই অনেকটা সফলও হয়েছেন তিনি। অন্তত শিল্পী শাহাবুদ্দিনের আঁকা রেসকোর্সে বক্তৃতারত বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সেই অপূর্ব চিত্রকর্মগুলোর চেয়ে এই কবিতাটিকেই আমার বেশি জীবন্ত মনে হয়। নির্মলেন্দু গুণের শব্দে আঁকা ছবির কিয়দংশ লক্ষ করুন—

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো
দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা–
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর
কবিতাখানি:
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।
সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের।

সত্যি তো সেই থেকে 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের। কে কোথায় 'স্বাধীনতার ঘোষণা' পাঠ করল তার জন্যে কেউ অপেক্ষা করেনি। অপেক্ষা করার কথা কেউ ভাবেওনি। কারণ ভাবার দরকারও হয়নি।

## চার

বঙ্গবন্ধুকে যারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং যারা নানাভাবে তাঁকে খাটো করার চেষ্টা করে আসছে তারাও এসব জানে। তারা ভালো করেই জানে 'সূর্য চিরদিবসের/মেঘ ক্ষণিকের'। সবকিছু জেনেও তারা বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাননি! স্পর্ধা দেখান চিমনির ধোঁয়া দিয়ে সূর্যালোককে ঢেকে দেওয়ার। তাদের এ স্পর্ধা দেখে মনে হয়, প্রায় ৩০ বছর আগে সন্তোষ গুপ্তের মনে যে 'ব্যথিত প্রশ্ন'টি জেগেছিল তা আজও প্রাসঙ্গিক বৈকি:

খদ্যোতে হরিয়া লবে
দ্যুতি চন্দ্রমার?
মৃগেন্দ্র-বিক্রমে বনে
বিচরিবে অজা?

লিলিপুটকে কখনো গালিভারের সমান করা যাবে না জেনেও দশকের পর দশক ধরে এদেশের কিছু জ্ঞানপাপী নানা কূটকৌশলে যা করে চলেছে তার নাম অপরাজনীতি। শিকড় ছাড়া যেমন বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, শক্ত ভিত্তি ছাড়া যেমন ইমারত হয় না, তেমনি মুক্তিযুদ্ধকে, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক এবং জাতির স্থপতিকে অস্বীকার করে বাংলাদেশ কখনোই সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আর সুস্থ ধারার যে রাজনীতির কথা এখন বেশ জোরেশোরে বলা হচ্ছে সে তো 'হনুজ দূর আস্ত'!

## পাঁচ

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে তিলে তিলে যে মিথ্যার প্রাসাদ গড়ে তোলা হয়েছে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া তো আর অত সহজ কাজ নয়। এসব বিবেচনা থেকে আমি ভাবতে উদ্বুদ্ধ হই যে এ দেশের মানুষ সত্যের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। একই সঙ্গে জাতীয় জীবন থেকে সর্বপ্রকার মিথ্যাকে বিদায় করে দেবে। তারপরও বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে সত্যকে কখনো মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।

**বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে সত্যকে কখনো মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না।**

তবে এসবে বঙ্গবন্ধুর কিছু যায়-আসে না। বঙ্গবন্ধু দেবতা ছিলেন না। তারপরও অতি ভক্তি, অজ্ঞতা কিংবা অন্য কোনো দিক থেকে যারা তাঁকে দেবতা বানানোর চেষ্টা করেছেন তারাও তাঁর যথেষ্ট ক্ষতি করেছেন। তিনি যা ছিলেন, তা-ই আছেন। তা-ই থাকবেন। তাঁর আসন থেকে তাঁকে বিন্দুমাত্র টলানোর ক্ষমতা কারো নেই। যারা সেই অপচেষ্টা করেছে তারা নিজেরাই তলিয়ে গেছে। অন্য যারা এখনো সেই অপচেষ্টায় রত আছে, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েও তাদের ঠাঁই মিলবে কিনা সেই সন্দেহ ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে।

## বিশ্বের সম্পদ

**ওয়াসিফ-এ-খোদা**

সাতই মার্চের ভাষণ মানে
ইতিহাসের বাঁক–
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের
স্বাধীনতার ডাক।

সাতই মার্চের ভাষণ জাগায়
বাঙালির প্রত্যয়–
ঘরে ঘরে দুর্গ আনে
জয় বাংলার জয়।

সাতই মার্চের ভাষণ আজও
উৎপীড়িতের জোর–
কবিতা এক, না-কাটা সেই
বজ্রকণ্ঠের ঘোর।

সাতই মার্চের ভাষণ এখন
বিশ্বের সম্পদ–
দেশে দেশে বাজবে যখন
করবে কে আর রদ?

বিশ্ববাসী শুনবে ভাষণ
জানবে বাংলাদেশ–
সাতই মার্চের ভাষণ নিয়ে
নাই গর্বের শেষ।

## বঙ্গবন্ধুর জয়

**তানভীর হোসেন চৌধুরী**

জনগণের কষ্টে যিনি
পেতেন মনে ব্যথা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর
তিনিই আমার নেতা।

তাঁর নেতৃত্বে একাত্তরে
স্বাধীন স্বদেশ হয়
তাই তো আমরা সবাই বলি
বঙ্গবন্ধুর জয়।

৬ষ্ঠ শ্রেণি
নবীগঞ্জ জে.কে হাই মডেল স্কুল,
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

ছবিটি এঁকেছে
মোসা. মহ্‌তাসিম জারিফ
পড়ে বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুলের
তৃতীয় শ্রেণিতে

## একটি ভাষণ করল শাসন

**ইফতেখার হালিম**

একটি ভাষণ শীর্ষ আসন করল ঠিকই জয়
সেই ভাষণে বাঙালিদের দূর হলো সব ভয়
একটি ভাষণ করল শাসন সুনাম বাঙালির
সেই ভাষণটিই যুদ্ধের বাঁশি অস্ত্র হাতে বীর
একাত্তরে নয় মাস ধরে জ্বলে দেশে আগুন
মুজিবের ডাকে মনের বনে ফুটল যেন ফাগুন
চাঁদ হাসে আর সূর্য হাসে আলোময় মানচিত্র
একে একে বাড়তে থাকে বাংলাদেশের মিত্র
তিরিশ লক্ষ প্রাণ হারিয়ে মাতৃভূমি মুক্ত
ইতিহাসে বাংলাদেশের নামটা হলো যুক্ত
মুজিব হলো মহানায়ক এবং জাতির পিতা
দয়ামাখা মন ছিল তাঁর দেশ জনতার মিতা
জীবনের চেয়ে বাসত ভালো প্রিয় দেশের মাটি
বুকের রক্তে ভিজিয়ে মাটি করল যে তা খাঁটি
জেল-জুলুমেই কেটে গেল তাঁর অমূল্য দিন
তাঁর অবদান শ্রেষ্ঠতম শোধ হবে না ঋণ।

## বিশ্বস্মৃতি

**পীযূষ কান্তি বড়ুয়া**

কবিতাটি কেউ শোনেনি আগে
সেই বিকেলে এসেছিল যারাই অনুরাগে
কবি ছিলেন কণ্ঠে আগুন জ্বেলে
তর্জনী তাঁর উঠল ঢেউয়ে হেলে।
উনিশ মিনিট কেটে গেল মুগ্ধ শ্রবণকাল
রেসকোর্সের সে উদ্যানে স্রোতের টালমাটাল
কবিতাটি বিশ্ব স্মৃতির ধন
এক কবিতায় পরাধীনতার শেকল অপনোদন।
সাত মার্চের সেই কবিতার তিনিই মহাকবি
তাঁর ভাষণে আগাম দিনের সমৃদ্ধির ছবি।
সেই কবিতা একটি বাংলাদেশ
ইউনেস্কোর বিশ্ব স্মৃতির চির জাগরুক রেশ।

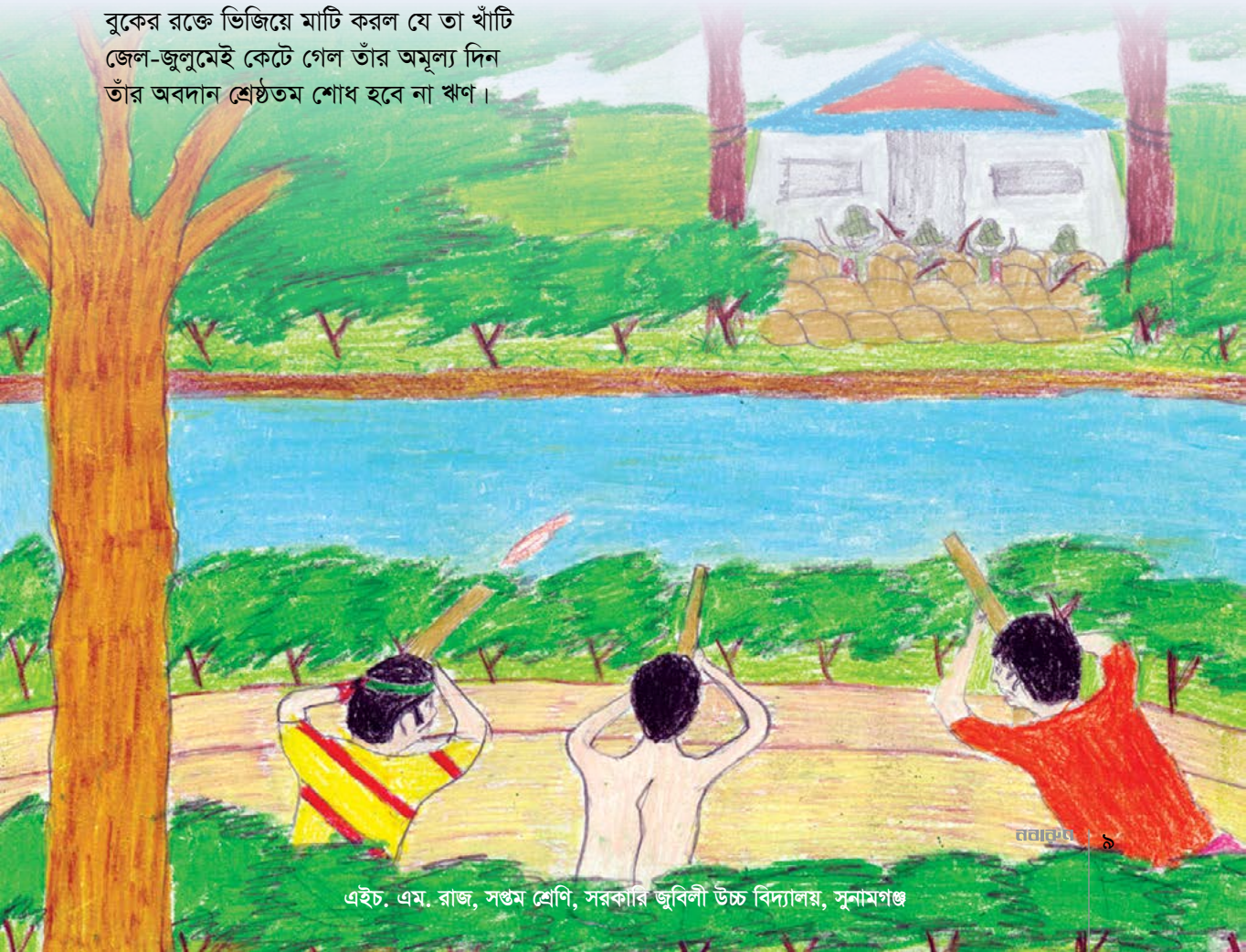

এইচ. এম. রাজ, সপ্তম শ্রেণি, সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ

## আমরা স্বাধীন

**দেলোয়ার হোসেন**

স্বাধীন স্বাধীন এদেশ স্বাধীন, স্বাধীন জনগণ,
তাই বলে করব না কারো অধিকার হরণ।
স্বাধীন স্বাধীন আমরা স্বাধীন, স্বাধীন সবার মন,
গায়ের জোরে লুটব না কেউ অন্য কারো ধন।

স্বাধীন বলেই যায় না করা ইচ্ছেমতো সব,
সবাই সবার দুঃখ ব্যথা করব অনুভব।
স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল সমান অধিকার,
ধনী-গরিব সবার জন্য থাকবে ন্যায়বিচার।

স্বাধীন স্বাধীন বলে কেন নাচব তা ধিন-ধিন,
মানুষ হয়ে হুঁশ হারালে আসবে দুঃখের দিন।
স্বাধীন সবার চলা-বলায় স্বাধীন সবার বাক,
সত্যটাকে ধারণ করে বাজাবো জয়-ঢাক।

পরিশ্রম আর মেধা দিয়ে গড়ব ইতিহাস,
শির উঁচিয়ে স্বাধীন দেশে করব সবাই বাস।
সোনার বাংলায় চলবে না ঘুষ, থাকবে না আর চোর,
ঝুল-কালি সব ঝেড়ে ফেলে সাফ করো অন্তর।

## বঙ্গবন্ধু

**মো. রিদওয়ানুল ইসলাম রিফাত**

শেখ মুজিবুর রহমান,
ওই নামে শোনো সারা বিশ্ব গায়
বাংলার জয়গান।
যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধারা
এক ছিল যাঁর নেতৃত্বে,
ভয় কী আমাদের, আমরা বাঙালি
বাঁচব মরব একসাথে।
পাকিস্তানি বর্বরদের বুলেট
বিদ্ধ করেছিল বাঙালির বুক,
তবুও তোমার অযুত প্রেরণায়
গর্জে উঠেছিল সকল মুখ।
বাঙালির মনে আর কখনো
আসবে না কোনো ভয়,
আমরা বাঙালি রক্ত দিয়ে
যুদ্ধ করেছি জয়।
৭৫ এর এক রাতে, স্বাধীনতার শত্রুর হাতে
দিতে হয়েছিল তোমায় প্রাণ,
তোমার জন্য স্বাধীন এ জাতি
তোমার স্মৃতি আমাদের মনে তাই চির অম্লান

*নবম শ্রেণি, বি.এ আর আই উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর।*

## জাতির পিতা

**সুস্মিতা চক্রবর্ত্তী অন্যা**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশের প্রাণ
আমরা সকল শিশু-কিশোর
গাইছি তোমার গান।

তোমার জন্য রক্ষা পেল
বাংলাদেশের মান
তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই
শেখ মুজিবুর রহমান।

**পঞ্চম শ্রেণি, রসময় মেমোরিয়াল হাই স্কুল**
**দাড়িয়াপাড়া, সিলেট।**

*হৈমন্তী বর্মণ পূজা, সপ্তম শ্রেণি, সরকারি এস.সি. বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়*

## সাত মার্চ

**ইমরান পরশ**

সাত মার্চ বাঙালির অতিশয় গর্বের
এই দিনই সূচনা স্বাধীনতা পর্বের।
উত্তাল ছিল সেই রেসকোর্স ময়দান
গেয়েছিল জনতা বাংলার জয়গান।
কাব্যের মহিমায় দোলায়িত ছন্দ
কারো মনে ছিল না তো এতটুকু দ্বন্দ্ব।
নির্ভীক জনতার ছিল না তো সংশয়
একজন কাণ্ডারি দিয়েছিল নির্ভয়।
রেসকোর্স ময়দানে উত্তাল ঢেউ ছিল
তাঁর বাণী রুখবার, বলো কি কেউ ছিল!
এবারের সংগ্রাম দিতে হবে অধিকার
বাঙালিই বুঝবে বাংলার গদি কার।
সেই শুরু বাঙালির স্বপ্নের বীজ বোনা
বাংলার এই মাটি হয় যেন কাঁচা সোনা।
স্বপ্নের ফেরিওয়ালা কাণ্ডারি মুজিবুর
প্রিয় গানে সুর দেন স্বাধীনতা সুমধুর।

## সাত মার্চের ভাষণ

**এইচ এস সরোয়ারদী**

সেই ভাষণটি আজও বাজে
আমার কানে কানে,
সেই ভাষণটি পাখিরা গায়
তাদের গানে গানে।

সেই ভাষণটির মর্মবাণী
কি-যে মিষ্টি লাগে,
সেই ভাষণটির আওয়াজ শুনে
আধমরাও জাগে।

সেই ভাষণটি সবার সেরা
জানো সে কি কারণ,
সেই ভাষণটি ঐতিহাসিক,
সাত মার্চের ভাষণ।

## পণ

**জসীম আল ফাহিম**

বলতে পারো কার আঙুলের
ইশারাতে স্বাধীন হলো
সোনার বাংলাদেশ?
কার ডাকেতে ছুটে গেল
লাখো মানুষ দলে দলে
ধরে বীরের বেশ।
তিনিই আমার মহান নেতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তাঁর নাম।
তাঁর ডাকেতে সাড়া দিয়ে
রক্ত দিয়ে শোধ করেছি
স্বাধীনতার দাম।
স্বাধীনতা বীর বাঙালির
বহু যুগের বহুকালের
সাধনার এক ধন।
স্বাধীনতা রাখব অটুট
বাংলাদেশের মাটি ছুঁয়ে
করেছি এই পণ।

*তপশ্রী চৌধুরী, চতুর্থ শ্রেণি*
*ড্যাফডিল কিন্ডার গার্টেন*

## জীবনবাজি

চন্দ্রশিলা ছন্দা

বলো দেখি কোথায় এমন রোদমাখা ভোর
নরম আদর কচি সবুজ ঘাস বিছানা?
কোথায় এমন আঁধার ভোরে মধুর সুরে
ঘুমটি ভাঙায় দোয়েল ছানা!
কোথায় এমন দুষ্টু বালক ধুলাবালি কাদা মাখা
মায়ের আঁচল মুখ মুছে দেয় শীতল বাতাস হাতের পাখা!
কোন মাটিতে লক্ষ শহিদ বকুল হয়ে আবার ঝরে!
বাবার চোখের জলগুলো ফের বৃষ্টি হয়ে গড়িয়ে পড়ে?
কোন দেশে ভাই ভাষার জন্য লড়াই করে জীবনবাজি
অনিয়ম সব রুখতে গিয়ে আবার জীবন দিতে রাজি!
সেই দেশটি কিনে নেওয়া রক্ত লালে
গোলাপ দামে
সবুজগ্রহের সেই দেশটি বিশ্ব চেনে বাংলা নামে।

## ফাগুন এল

তাহরিমা আলম কেয়া

আসলো ফাগুন, লাগল আগুন,
চারিদিকে সাজ সাজ
মনের মাঝে টগবগিয়ে
খুশির জোয়ার বইল আজ

বনে বনে ডালে ডালে
পাখপাখালি উঠল মেতে
পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া
আসলো সেজে একই সাথে

পূব আকাশে সুয্যি মামা
উঁকি দিল খুশি মনে
ধরার মাঝে মধুর ভানে।
লাগল হাওয়া গানে গানে।

হাল খুলে, পাল তুলে
নৌকাখানি চলল ভেসে
ঝিকিমিকি উঠল তারা,
উঠল চাঁদ নীল আকাশে।

## ভালোবাসি

শেখ দুলাল

ভালোবাসি সকল সময়
সত্য কথা বলা,
হিংসা- বিদ্বেষ ছেড়ে দিয়ে
ন্যায়ের পথে চলা।
ভালোবাসি সকল সময়
নদীর জলে স্নান ,
দখিন হাওয়ায় মেতে ওঠা
ফুল ফসলের ঘ্রাণ।
ভালোবাসি সকল সময়
জন্মভূমির মাটি ,
বটের মূলে বিছিয়ে দেওয়া
শান্ত শীতলপাটি।

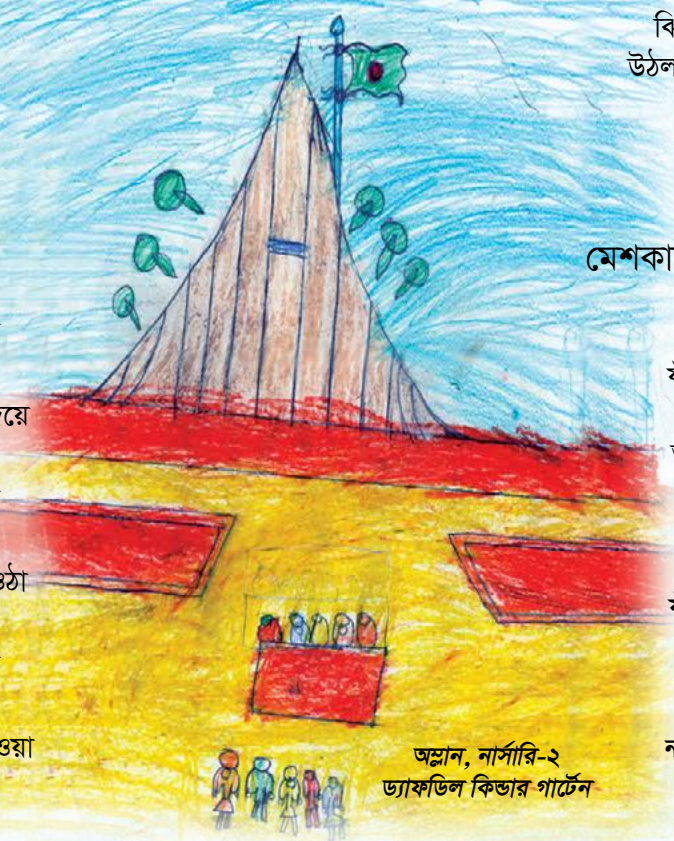

*অম্লান, নার্সারি-২*
*ড্যাফডিল কিন্ডার গার্টেন*

## আত্মত্যাগ

মেশকাউল জান্নাত বীথি

স্বাধীনতা যুদ্ধে
যাঁরা দিয়ে গেলেন প্রাণ
ভুলব না কোনোদিন
তাঁদের এই আত্মদান।

যুগ যুগ বেঁচে থাকুক
সে সকল বীর সেনা
যাঁদের রক্তের বিনিময়ে
সোনার বাংলা কেনা।

*৮ম শ্রেণি*
*ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল*
*খিলগাঁও, ঢাকা।*

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ১৭ই মার্চ। ১৯২০ সালের এই দিনে বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এই নেতা, যাঁর হাত ধরেই এসেছে আমাদের স্বাধীনতা। আনন্দের এই দিনটি পালিত হচ্ছে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে।**

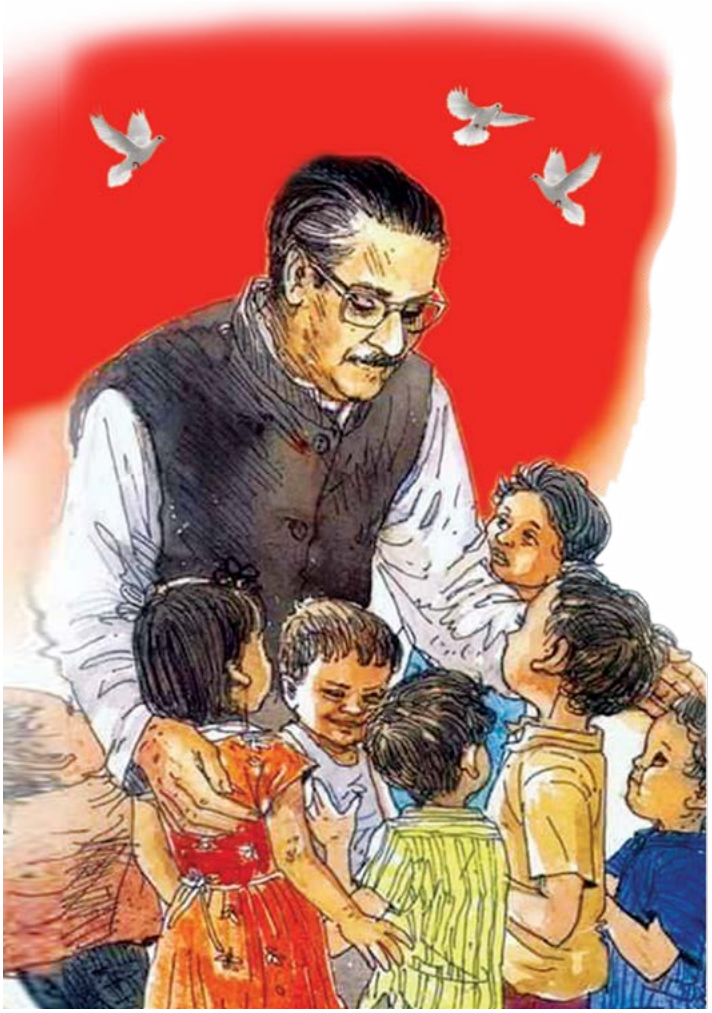

## আজ আমাদের খুশির দিন

জুনায়েদ তৌহিদ

বঙ্গবন্ধু, তোমার আজ জন্মদিন
বাংলাদেশের খুশির দিন।
তুমি তো ছিলে ভালো
দুঃখ বুঝতে সবার,
তোমার নীতি আলো দেখায়
তোমার মতো হবার।
তোমার জন্ম সবার সুখ
তোমার মৃত্যু সবার দুখ।
তোমার কথায়, তোমার আলোয়
আমরা করেছি বিশ্ব জয়,
তুমি ভাষণ না দিলে সেদিন
ঘন আঁধারে ডুবত সবাই।
বঙ্গবন্ধু তোমাকে হারালেও
তুমি আমাদের সাথে আছো,
মনে হয় বাংলাদেশকে এখনো
অনেক ভালোবাসো।

বঙ্গবন্ধু, তোমার আজ জন্মদিন
শিশু-কিশোরদের হাসির দিন।

*৪র্থ শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়*
*গোপালগঞ্জ*

# ৭ই মার্চের ভাষণ কীভাবে হলো বিশ্বের

ফারহানা আহমেদ চৌধুরী

বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয় জেনেছো মহা আনন্দের খবর? গত ৩০শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারভুক্ত হয় এই ভাষণটি।

এই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে কী হলো? এই ঐতিহাসিক প্রামাণ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিল বিশ্ব মানবতা।

## মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড-এর কার্যক্রম

মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনেস্কোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যার মাধ্যমে বিশ্ব মানবতার বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হয় । এই কার্যক্রমের মূলনীতি হলো- বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক ঐতিহ্য সমগ্র মানবতার সম্পদ। মানবজাতির স্বার্থেই এই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা করতে হবে। সামাজিক বাস্তবতা এবং রীতিনীতিকে আমলে নিয়ে এই প্রামাণ্য ঐতিহ্যে সবার স্থায়ী প্রবেশাধিকারও নিশ্চিত করতে হবে।

১৯৯২ সাল থেকে ইউনেস্কোর এই কার্যক্রম শুরু হয় এবং এ পর্যন্ত ৪২৭ টি প্রামাণ্য ঐতিহ্য এবং সংগ্রহ মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারভুক্ত হয়। ২০১৬-২০১৭ বর্ষে সর্বমোট ৭৮ টি প্রামাণ্য ঐতিহ্য এই রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়। যার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ অন্যতম ।

এই কার্যক্রম ১৪ সদস্যবিশিষ্ট আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটি দিয়ে পরিচালিত। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক এসকল উপদেষ্টাদের নিয়োগ দেন। বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আব্দুল্লাহ আল রাইসি, এই আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Memory of the World 20th Anniversary

## পেছনের কথা

সাম্প্রতিক সময়ে ইউনেস্কোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কোর মাধ্যমে

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্বসভায় তুলে ধরার কার্যক্রম জোরদার করে। মিশনের এই প্রচেষ্টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশের সুন্দরবন, বাগেরহাট ষাটগম্বুজ মসজিদ, পাহারপুর বৌদ্ধ বিহার এবং বিশ্বের বিমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব তালিকায় বাউল গান (২০১১), জামদানি (২০১৩) ও পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) অন্তর্ভুক্তির গৌরব অর্জন করে।

ইউনেস্কোর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তালিকা 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে' বাংলাদেশের কোনো দলিল অন্তর্ভুক্ত না থাকায় ইউনেস্কোতে নিয়োজিত বাংলাদেশের তৎকালীন স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত এম. শহিদুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

যেই কথা সেই কাজ। ২০১৬ সালের শুরুতে প্যারিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস এই রেজিস্টারে বাংলাদেশের প্রামাণ্য ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়াগত দিক সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান চালায়। শুরুতেই দূতাবাস যে সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলো ৭ই মার্চের ভাষণের কোনোরূপ লিখিত দলিলের অনুপস্থিতি। এর সমাধান কীভাবে হলো?

মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কার্যক্রমের দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালক মি. ইন্দ্রজিত ব্যানার্জী কে বিষয়টি অবগত করা হলে তিনি জানান যে, লিখিত দলিলের অনুপস্থিতিতে অডিও ভিজ্যুয়াল এবং প্রামাণ্য দলিলের ডিজিটাল কপির মাধ্যমেও মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করা যাবে। এ বিষয়ে আশ্বস্ত হওয়ার পরে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আর কোনো টেকনিক্যাল বাধা রইল না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্ট্রদূত মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে অবহিত করেন এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানতে চান। মন্ত্রী মহোদয় তৎক্ষণাৎ ৭ই মার্চের ভাষণটিকে মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ দূতাবাস এ বিষয়ে ইউনেস্কোর প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী মনোনয়ন নথি প্রস্তুতির কার্যক্রম শুরু করে।

**মনোনয়ন নথি প্রস্তুত করা হলো যেভাবে**

কোনো ডকুমেন্টকে মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারভুক্ত করার জন্য যে মনোনয়ন নথি প্রস্তুত করা প্রয়োজন সেই প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল এবং কষ্টসাধ্য । এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রদূত ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর সচিব জনাব মনজুর হোসেনের কাছে জানতে চান যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর ইতিপূর্বে কোনো কাজ হয়েছে কি না। জনাব মনজুর রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে জানান যে, ২০১৩ সালে কম্বোডিয়াতে মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড সংক্রান্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর মহাসচিব ও সে সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হককে মনোনয়ন প্রদান করেন। কর্মশালায় উপস্থাপনের জন্য জনাব মফিদুল হক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের উপর একটি মনোনয়ন নথি প্রস্তুত করে কম্বোডিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন। তবে কর্মশালার আয়োজক কর্তৃপক্ষ নথিটি গ্রহণ না করায় জনাব মফিদুল হক কর্মশালায় যোগদান করতে পারেননি এবং সেখানেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটে ।

রাষ্ট্রদূত এম. শহিদুল ইসলাম ১৯৯২-১৯৯৫ সালে কলকাতা মিশনের দ্বিতীয় সচিব থাকাকালীন সময়ে জনাব মফিদুল হকের সাথে পরিচিত হন। পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে তিনি অবিলম্বে জনাব মফিদুল হকের সাথে টেলিফোন এবং ই-মেইল যোগাযোগ করেন। জনাব মফিদুল হক ১৭ই মে ২০১৬ তারিখে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উপর পূর্ব প্রস্তুতকৃত ড্রাফট মনোনয়ন নথিটি ই-মেইল যোগে রাষ্ট্রদূত মহোদয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। নথিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, এটি তৈরি করা হয়েছিল বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ৪৫ আর পি এম রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে। এই ৪৫ আর পি এম রেকর্ডটি তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য জনাব এম এ খায়ের কর্তৃক প্রস্তুতকৃত যা বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত

ছিল। জনাব মফিদুল হকের পাঠানো নথির যথার্থতা ও পর্যাপ্ততা যাচাইয়ের জন্য রাষ্ট্রদূত মহোদয় সে সময়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের (ডিএফপি) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খানের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জানতে পারেন যে, ৭ই মার্চের ভাষণের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাহক রয়েছে।

জনাব লিয়াকত আলী খান জানালেন, ৭ই মার্চের ভাষণের প্রথম অসম্পাদিত রেকর্ডটি ধারণ করেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা স্টেশনের প্রোগ্রাম অফিসার জনাব নসর আহমেদ চৌধুরী। রেকর্ডকৃত ভাষণটি বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব এ কে এম নেসার উদ্দিন ভূঁইয়া উপরোক্ত তথ্যটির সত্যতা নিশ্চিত করেন।

৭ই মার্চের ভাষণের মূল চলচ্চিত্র সংস্করণটির রেকর্ড করেছিলেন তৎকালীন চলচ্চিত্র বিভাগের (এখন এটি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) প্রধান জনাব মহিবুর রহমান খায়ের, যা বাংলাদেশ ফিল্মস আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপরোক্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

৭ই মার্চের ভাষণের অডিও ভিজ্যুয়াল রেকর্ডিং-এর জন্য ব্যবহৃত সকল সরঞ্জামাদি (৩৫ মি. মি. ফিল্ম নেগেটিভ ও পজিটিভ, এ আর আর আই ক্যামেরা, লেন্স,ট্রাইপড, মাইক্রোফোন, নাগরা রেকর্ডার ইত্যাদি) ডিএফপির কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। চলচ্চিত্র এবং প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী খান নিজেই উপরোক্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন।

মনোনয়ন নথি জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ছিল ৩১শে মে ২০১৬। তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম ১৭ই মে থেকে ২৪শে মে ২০১৬ তারিখের মধ্যে টেলিফোন এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

ডিএফপি, বিএফএ, বাংলাদেশ বেতার এবং মিশন কর্তৃক বিভিন্ন উন্মুক্ত সূত্র হতে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণপূর্বক এই সত্য স্পষ্ট হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিকট সংরক্ষিত ৪৫ আর পি এম রেকর্ডের ভিত্তিতে মনোনয়ন নথি তৈরি করা হলে তা অসম্পূর্ণ রূপে বিবেচিত হতো। কেননা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের আরো অনেক বাহক রয়েছে এবং উক্ত ভাষণের বিষয়বস্তুর উপর আরো কাজ করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই সকল তথ্যের উপর ভিত্তি করে জনাব মফিদুল হকের প্রাথমিক ড্রাফটির আমূল পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়। সকল নির্ভরযোগ্য উৎস হতে প্রাপ্ত প্রকৃত ইতিহাস, সঠিক বর্ণনাসহ মনোনয়ন নথি তৈরি করা হয়।

প্রস্তুতকৃত মনোনয়ন নথিতে যেসব প্রামাণ্য দলিল যোগ করা হয়, তা হচ্ছে :

ক. ১৯৭১-এর ৮ই মার্চ তারিখে তৎকালীন পাকিস্তান রেডিও (যা বর্তমানে বাংলাদেশ বেতার) থেকে প্রচারিত ৭ই মার্চের ভাষণের ১৯ মিনিটের মূল অসম্পাদিত রেকর্ড সংস্করণ।

খ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংরক্ষিত ৭ই মার্চের ভাষণের একটি ৪৫ আর পি এম রেকর্ড যা তৎকালীন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম কর্পোরেশন লি. কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদনের ফলে এর দৈর্ঘ্য ১৫ মিনিট।

গ. ১৯৭২ সালে ডিএফপি কর্তৃক ৭ই মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত একটি ৩৫ মি. মি. ফিল্ম ফুটেজ এবং প্রমিত অডিও ভিজ্যুয়াল প্রামাণ্যচিত্রের মূল সংস্করণ

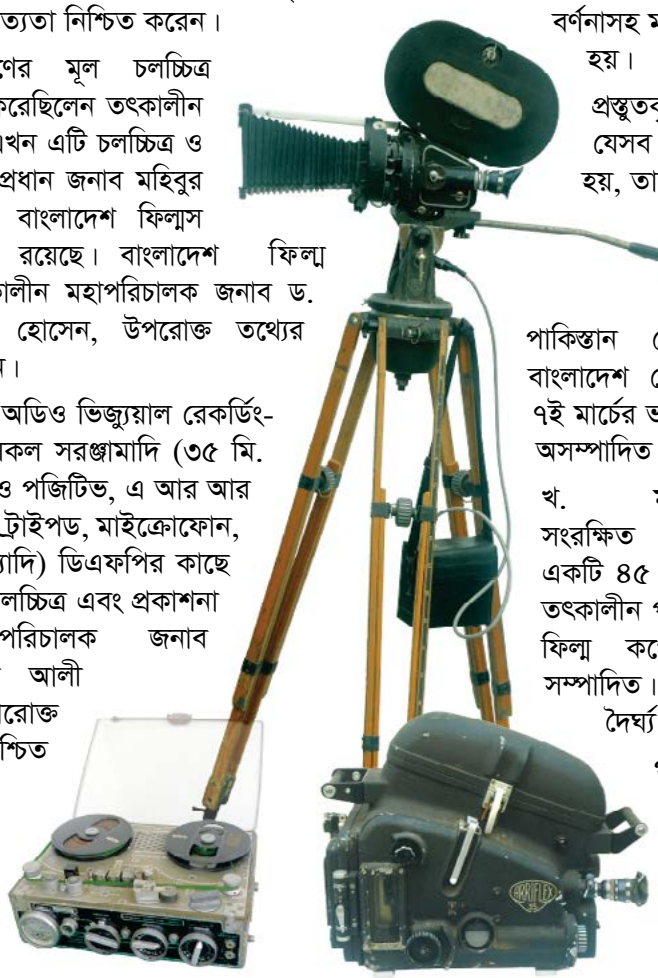

*৭ই মার্চের ভাষণের ধারণকৃত ডিএফপির ক্যামেরা এবং রেকর্ডার*

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Memory of the World

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION

Certifies the inscription of

*The Historic 7th March Speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman*

*Department of Films and Publications*

(Institution)

*Dhaka* (Town) — *Bangladesh* (Country)

ON THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL REGISTER

*30 October 2017* (Date)

Irina Bokova

*Irina Bokova*
*Director-General, UNESCO*

***জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ ধারণে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখার জন্য চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) কে সম্মাননা সনদপত্র প্রদান করে ইউনেস্কো***

যা বর্তমানে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষিত আছে।

ঘ. ২০১৩ সালে বাংলাদেশের ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক নির্মিত ৭ই মার্চের ভাষণের উন্নততর ডিজিটাল সংস্করণ।

ঙ. ২০১৪ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৭ই মার্চের ভাষণের উন্নততর ডিজিটাল সংস্করণ।

চ. ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণদানরত অবস্থার স্থিরচিত্র।

ছ. ৭ই মার্চের ভাষণের চলচ্চিত্র রেকর্ডিং-এর লিংক।

জ. ৭ই মার্চের ভাষণের শব্দ রেকর্ডিং-এর লিংক।

ঝ. ৭ই মার্চের ভাষণের বাংলা এবং ইংরেজি প্রতিলিপি।

বলে রাখছি, এই ভাষণের অবিসংবাদিত জনপ্রিয়তার কারণে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র বা প্রচারণার জন্য এই ভাষণের বিভিন্ন ধরনের অডিও ভিডিও সংস্করণ তৈরি ও ব্যবহার করেছেন যা উক্ত মনোনয়ন নথিতে যুক্ত করা হয়নি।

৭ই মার্চের ভাষণের বাহকসমূহের যথার্থতা চূড়ান্ত করার পর এগুলো সংরক্ষণের ইতিহাস বিশদভাবে তুলে ধরে দূতাবাস ভাষণটির বিষয়বস্তুর উপর কার্যক্রম শুরু করে। মনোনয়ন নথিতে ৭ই মার্চের ভাষণ সংরক্ষণের ইতিহাস, এর বিশ্ব তাৎপর্য, অসামান্য নান্দনিক, শৈলীগত বা ভাষাগত মূল্য এবং এর সামাজিক/আধ্যাত্মিক/সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য ইত্যাদি যুক্তিসংগতভাবে তুলে ধরা হয়। যদিও জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে এ ভাষণের গুরুত্ব নিয়ে কোনো পর্যায়েই কোনো দ্বিমত ছিল না। মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির জন্য ভাষণের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সঠিকভাবে তুলে ধরা সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর প্রধান কারণ হলো, বিশ্বের সবাই এই ভাষণের পটভূমি সম্পর্কে সমানভাবে জানত না। এক্ষেত্রে, দূতাবাস নানা উন্মুক্ত উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর গবেষণা করে এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য তুলে ধরে। যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের যে ভাষণ সাত কোটি বাঙালিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে ভাষণ যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতাকামী মানবতার অনুপ্রেরণা এবং শক্তির উৎস হয়ে থাকবে ।

অর্থাৎ এই ভাষণটির আবেদন স্থান ও কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। এই ভাষণ নিজ গুণে বিশ্বে স্থান করে নিয়েছে বিখ্যাত লেখক এবং ইতিহাসবিদ Jacob F. Field-এর *We shall fight on the beaches: the Speeches that inspired History* গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই ভাষণটি বিগত ২৫০০ বছরের বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে উদ্দীপ্তকারী এবং অনুপ্রেরণামূলক যুদ্ধকালীন ভাষণ। এছাড়াও, বিষয়বস্তু এবং এর

প্রেক্ষাপটের কারণে এ ভাষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

**মনোনয়ন নথি চূড়ান্তকরণ এবং জমা প্রদান**

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মতো একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে মনোনয়ন নথি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসকে অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। একই সাথে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় যাতে কোনো দেশ বা গোষ্ঠী এই প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে না পারে। মনোনয়ন নথিটি সঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য ২৫শে মে ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রদূত ইউনেস্কোর 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' কার্যক্রমের দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সাথে বৈঠক করেন। প্রস্তুতকৃত মনোনয়ন নথির কারিগরি দিকগুলোর যথোপযুক্ততা নিয়ে আলোচনা করেন। সেই বৈঠকের নির্দেশনা অনুসারে মনোনয়ন নথি পুনর্বিন্যাস করেন। বিশেষ করে আবেগ নিঃসৃত বক্তব্য পরিহার করে তথ্য উপাত্তের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে নথিটি সংশোধন করা হয়।

মনোনয়ন নথি প্রস্তুত হওয়ার পর তা বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় যাতে কোনোরূপ তথ্যগত ভুল না থাকে। ৩০শে মে ২০১৬ বাংলাদেশ মিশন প্যারিস-এর প্রথম সচিব হিসেবে আমি মনোনয়ন নথিটি ইউনেস্কো সদর দপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দেই।

**৭ই মার্চের ভাষণটি বিগত ২৫০০ বছরের বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে উদ্দীপ্তকারী এবং অনুপ্রেরণামূলক যুদ্ধকালীন ভাষণ।**

**মনোনয়ন নথি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া**

মনোনয়ন নথিটির মূল্যায়ন প্রক্রিয়া তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্রথম 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' সচিবালয়ের টেকনিক্যাল কমিটি নথিটির কারিগরি দিক মূল্যায়ন করে। নথিটিকে পরবর্তী পর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য যোগ্য বিবেচিত করে এবং তা পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নের জন্য রেজিস্টার সাব কমিটির কাছে প্রেরণ করে।

এরপর ২৬শে থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭-এর রেজিস্টার সাব কমিটির মনোনয়ন নথি মূল্যায়ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১০শে এপ্রিল ২০১৭-এর মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড কার্যক্রমের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান মি. বোয়ান রাদয়কভ চিঠি দিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসকে জানান যে, রেজিস্টার সাব কমিটি মনোনয়ন নথিটি পরবর্তী পর্যায়ের মূল্যায়নের জন্য নির্বাচিত করেছে। তবে কমিটি নথিতে উল্লিখিত রেকর্ডিং-এর জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামাদি ( ক্যামেরা, লেন্স ,ট্রাইপড, মাইক্রোফোন এবং নাগরা রেকর্ডিং মেশিন) বিয়োজন করে আবারো নথিটি ৮ই মে ২০১৭ তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সেই মোতাবেক বাংলাদেশ দূতাবাস নথিটি পুনর্বিন্যাস করে ১৭ই এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জমা দেয়। আর একটি ধাপ পেরোলেই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই পর্যায়ে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজারি কমিটি (আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটি) নথিটি বিবেচনা করে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করবে।

কিন্তু না, আবার ঝামেলা তৈরি হলো।

ইতোমধ্যে, ১৯৩৭ সালে সংগঠিত নানকিং হত্যাযজ্ঞ ২০১৬ সালে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে রেজিস্টার ভুক্ত হওয়াকে কেন্দ্র করে চীন এবং জাপানের মধ্যে বিবাদ লেগে গেল। জাপান দাবি করে যে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে আলোচনা না করে কোনো মনোনয়ন পেশ করা যাবে না । এই বিবাদের কারণে সেপ্টেম্বর ২০১৭-এর প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

নতুন নিয়মের অধীনে মনোনয়ন নথি পেশ করার আগে সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে আলোচনার অর্থ হলো ৭ই মার্চের ভাষণের নথি বিবেচনার পূর্বেই পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় যেতে হবে। কেননা, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন পাকিস্তানের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে। পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় গেলে জটিলতা তৈরি হবে। কেন হবে, তা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ।

এই অবস্থায় রাষ্ট্রদূত এম. শহিদুল ইসলাম ইউনেস্কোর মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাটি যাতে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি জানাতে থাকেন। চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার কূটনীতিকরাও এই দাবিতে সমর্থন দেন বাংলাদেশকে।

*ইউনেস্কোর কার্যালয়ে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, ইউনেস্কোর সাবেক মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভা, রাষ্ট্রদূত এম. শহিদুল ইসলাম ও লেখকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ*

পরবর্তীতে ১৬ই অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ইউনেস্কোর ২০২তম নির্বাহী বোর্ডের সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় ইতোমধ্যে যে সমস্ত মনোনয়ন নথি বিবেচনায় রয়েছে, সে সমস্ত প্রস্তাব আগের নিয়মেই নিষ্পন্ন হবে এবং আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির মূল্যায়ন সভা পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অর্থাৎ ২৪শে থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

খুব বড়ো ঝামেলাটা কেটে গেল অবশেষে।

২৪শে থেকে ২৭শে অক্টোবর ২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হলো। এই সভায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার-এ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশ করে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভার কাছে পাঠানো হয়।

অবশেষে এল ৩০শে অক্টোবর ২০১৭। ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভা মনোনয়ন নথিটি চূড়ান্ত অনুমোদন করার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্যারিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের দক্ষ কূটনৈতিক নেতৃত্বে একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টার সফল পরিসমাপ্তি ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা ও রূপকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রাপ্তির মাধ্যমে। এই সাফল্যের পিছনে বাংলাদেশের যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা।

এই অসামান্য কূটনৈতিক সাফল্যের সাথে প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি আমার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এম শহিদুল ইসলামের কাছে কৃতজ্ঞ।

**শেষ কথা**

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটি অসাধারণ ভাষণ। যার মহত্ত্ব কারো স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে না। ঢাকাস্থ ইউনেস্কোর প্রতিনিধি বিয়াত্রিস কালদুন যথার্থই বলেছেন, এই মহান ভাষণটিকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ইউনেস্কোও গর্বিত।

এরপরও বলতে হয়, ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি জাতিসংঘের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কোর মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারভুক্ত হওয়া বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন, কারণ এই স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য জাতীয় গণ্ডি পার হয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করল।

**"এই মহান ভাষণটিকে স্বীকৃতি দিতে পেরে ইউনেস্কোও গর্বিত।"**

# আমার দেখা ৭ই মার্চ

**ডা. নূরল হক**

আমি তখন সোহরাওয়ার্দী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ১ম বর্ষের ছাত্র। দিনাজপুর জেলার বিরামপুর হাই স্কুল থেকে ১৯৭০ সালে এসএসসি পাস করে ঢাকায় পড়াশুনা করতে ছোটো খালার বাসায় উঠি। পুরাতন ঢাকার লক্ষীবাজারে মিউনিসিপ্যালিটির পেছনে তাদের বাসা। খালুর বাংলাবাজারে বইয়ের দোকান। কলেজে ক্লাস করা আর লেখাপড়ার ফাঁকে মাঝেমধ্যে দোকানে বসি। দোকানটি একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হওয়ার সুবাদে কবি-সাহিত্যিক, লেখকসহ বিভিন্ন বয়স আর পেশার লোকদের আসা-যাওয়া চলত নিয়মিত। আমিও বসে বসে তাদের অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির কথা শুনি। দেশজুড়ে তখন টানটান উত্তেজনা। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক দল তাদের এ শোচনীয় পরাজয়ের পরও বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও যড়ষন্ত্র করতে থাকে। প্রতিবাদে সারা বাংলাদেশ গর্জে উঠে। ঢাকার রাজপথে উন্মত্ত জনতার ঢল নামল। ৩রা মার্চ পল্টন ময়দানের বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু সারা পূর্ব বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এর পরপরই জানতে পারলাম, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ভাষণ দিবেন। প্রায় ৪ যুগ আগের সেই ঘটনাগুলোর সবকিছু দিন তারিখ অনুযায়ী মনে না থাকলেও তখনকার সেই উত্তেজনা, অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা এখনো স্মৃতির পাতায় জ্বলজ্বল করছে। ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা লোকমুখেই ছড়িয়ে গেল সবখানে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে সে দিনটির জন্য। কখন বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিবেন, কী বলবেন, স্বাধীনতার ডাক তিনি কী দেবেন? এই পরিস্থিতিতে ঢাকার বাতাসে

নানা ধরনের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছিল। ধারণা করা হচ্ছিল, যে-কোনো সময় পাকিস্তানের পূর্ব অংশের স্বাধীনতার ঘোষণা আসতে পারে।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ছিল এক উত্তেজনাপূর্ণ দিন। সেদিন ছিল রোববার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সকালবেলা নাস্তা শেষ করে বেলা ১০টার দিকে বাসা থেকে বের হলাম রেসকোর্স ময়দানে যাওয়ার জন্য। সাথে বন্ধু সোহরাব, শাহ আলম, জিল্লুর ও আরো অনেকে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটির (তখন ঢাকা সিটি করপোরেশন-এর হেড অফিস ছিল ওটাই) সামনের রাস্তা দিয়ে ভিক্টোরিয়া পার্কের (বর্তমান বাহাদুর শাহ পার্ক) উত্তর-পশ্চিম রাস্তা ধরে নবাবপুর আসলাম। দেখতে পেলাম বুড়িগঙ্গা নদীর ওপার থেকে সদরঘাট হয়ে বাংলাবাজার ও ইসলামপুরের দিক থেকে হাজার হাজার মানুষের মিছিল স্লোগান দিতে দিতে নবাবপুর রোড দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশে। আমরাও সামিল হলাম সেই মিছিলে। গুলিস্তান পৌঁছার পর দেখতে পেলাম সায়েদাবাদের দিক থেকে হাজার হাজার মানুষ আকাশ-বাতাস স্লোগানে মুখরিত করে বঙ্গভবনের সামনে দিয়ে গুলিস্তান অতিক্রম করে গোলাপশাহ মাজারের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অন্য দিকে লক্ষ মানুষের স্রোতের কোনোটা জিপিও হয়ে সেক্রেটারিয়েটের সামনের রাস্তা ধরে আবার কোনোটা প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে রেসকোর্স ময়দানের দিকে ধাবমান। মনে হচ্ছিল, রেসকোর্স ময়দানের দিকে চতুর্দিক থেকে পিপীলিকার মতো মানুষ ছুটে চলেছে অজানা এক আকর্ষণে। আমিও সচিবালয়ের সামনের রাস্তা দিয়ে কার্জন হল অতিক্রম করে বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশ করি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে এখানে প্রতি রবিবার ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। তাই মাঠটি ঢাকা রেসকোর্স হিসেবে পরিচিতি পায় (পরে এর নামকরণ হয়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ফাগুনের হালকা শীতের আমেজ একটু করে গায়ে লাগছে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। পড়ন্ত বেলায় চারদিক থেকে অগণিত মানুষ মিছিলের পর মিছিল নিয়ে জড়ো হচ্ছে রেসকোর্স ময়দানে। এক সময় রেসকোর্স ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হলো। জনগণের হাতে ব্যানার, প্ল্যাকার্ড আর লাঠি। শুনলাম- যে-কোনো সময় পাকিস্তান সামরিকবাহিনী এখানে আঘাত হানতে পারে, এমনকি বিমান আক্রমণও হতে পারে। এমন সময় আমি আকাশে বিমানের শব্দ শুনতে পেয়ে উপরে তাকিয়ে দেখলাম-একটি বিমান ধীরগতিতে রেসকোর্স ময়দানের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে উড়ে গেল। প্রথমে ভয় পেলেও সাহস করে আমিও সবার সাথেই বসে থাকলাম মাঠের মধ্যখানে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, কখন বঙ্গবন্ধু আসবেন, কখন বক্তৃতা দিবেন। এক সময় তিনি আসলেন, তখন বিকেল তিনটে গড়িয়ে গেছে। রাজনীতির সেই মহাকবি ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কণ্ঠের স্লোগানে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। 'শেখ মুজিবের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'মুজিব ভাইয়ের পথ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'তোমার দেশ, আমার দেশ, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' ইত্যাদি স্লোগানে পুরো রেসকোর্স ময়দান প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তখন সারা শরীর শিহরিত হয়ে উঠে প্রবল এক উত্তেজনায়। বঙ্গবন্ধু হাত নেড়ে সবাইকে শান্ত থাকতে ইশারা করলেন। তারপর তিনি ভরাট কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন-ভায়েরা আমার...। শুরু হলো সেই ঐতিহাসিক ভাষণ।

সেদিন ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের কালজয়ী ভাষণটি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছিলাম। এই ভাষণে কারো মনে কোনো বিরক্তি ছিল না। মনে হচ্ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত বক্তৃতা দিলেও শোনার আকাঙ্ক্ষা শেষ হবে না। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, ময়দানে প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষের কণ্ঠ যেন একটি মুজিবুরের কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণচাঞ্চল্য দেখে বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য জনতার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হচ্ছিল। আজ এত বছর পর ৭ই মার্চের ভাষণটি যখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হলো, তখন মনে হলো, তা যথার্থই হয়েছে। ইউনেস্কোর 'মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মতোই এটি একটি ভাষণ। সেদিনের কথা মনে হলে এখনো আমার বুক গর্বে ফুলে উঠে যে, আমিও সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন ভাবিনি, এই ভাষণটিই একদিন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হবে। এখন আমরা গর্বের সাথে বলতে পারব- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ এখন বিশ্ব ঐতিহ্য।

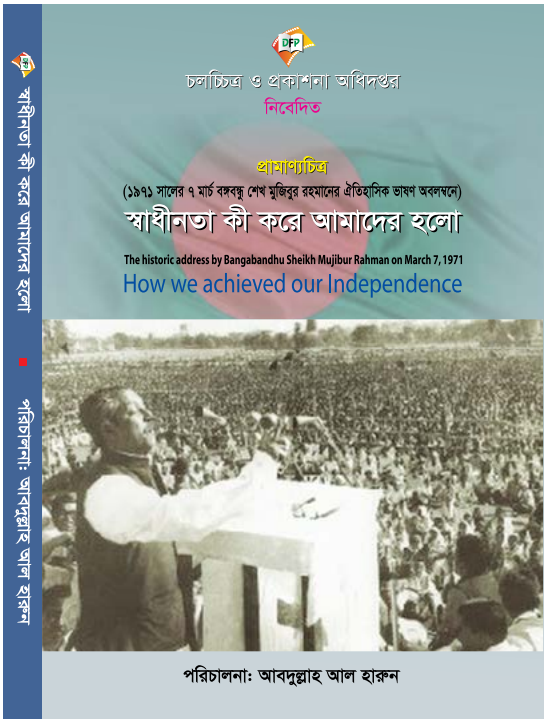


# ৭ই মার্চ নিয়ে ডিএফপি'র প্রামাণ্য চিত্র

**মেজবাউল হক**

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক গৌরবময় দিন। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (পরে নামকরণ করা হয় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে এক নতুন পথ দেখিয়েছিলেন। আহ্বান জানিয়েছিলেন বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার। এতে বাঙালির অধিকার আদায়ের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনার পাশাপাশি ছিল ভবিষ্যৎ কর্মসূচির স্পষ্ট নির্দেশনা এবং শোষকের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি। কালজয়ী এই মানুষটির মন্ত্রমুগ্ধ আহ্বানে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি ঐ সময়ে ধারণ করেছিল চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (এক সময়ের চলচ্চিত্র বিভাগ)। এ ভাষণটি নিয়ে এ অধিদপ্তর-ই নির্মাণ করেছে মূল্যবান একটি প্রামাণ্য চিত্র—'স্বাধীনতা কী করে আমাদের হলো'। জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত চিত্র প্রযোজক আবদুল্লাহ আল হারুন নির্মিত ২০ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই প্রামাণ্য চিত্রে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ভাষণ শুনতে আসা বিশাল জনতার উন্মাদনা, মিছিলে মিছিলে সমাবেশে আগমন, নারী-পুরুষের সম্মিলিত অবস্থানসহ ঐতিহাসিক ভাষণের বিভিন্ন দিক। রয়েছে ভাষণ নিয়ে গুণীজনদের সাক্ষাৎকার। এছাড়াও তুলে ধরা হয়েছে ডিএফপির চিত্রগ্রাহক আমজাদ আলী খন্দকারের সাক্ষাৎকার। তিনি জানিয়েছেন ভাষণটির ধারণ ও সংরক্ষণে সেই সময়ে তিনিসহ ডিএফপির কর্মকর্তাদের জীবনবাজি রেখে কাজ করার অভিজ্ঞতা।

বন্ধুরা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো। ভাষণটি স্থান পেয়েছে মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে, যা আমাদের জন্য এক বিশাল প্রাপ্তি। বাঙালির প্রাণের এই ভাষণটি শুধু আমাদের নয়, এখন ৭ই মার্চের ভাষণ সারা বিশ্বের। এই বিষয়টি নিয়েও একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। যেটি বাস্তবায়ন করবে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর। আর এটি নির্মাণের দায়িত্বেও থাকছেন চিত্র প্রযোজক আবদুল্লাহ আল হারুন।

## মনের আয়না

**প্রজ্ঞা জ্যোতি দে**

আয়নায় যেদিন আঁকলাম
সবুজ জমিনে টকটকে লাল সূর্যটা,
এ তো নয় আমার মনের দেয়াল
এ তো আমাদের পতাকা।

আকাশের কাছে রৌদ্রের আঁচে
যখন ওড়ে এই পতাকা
মনে হয় যেন মুখেতে তার
ফুটেছে সেই গানটা।

এই পতাকাই আমার শক্তি-গর্ব
জাতিকে চেনার বড়ো আয়না।

*দশম শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।*

# উন্নয়নশীল দেশের পথে

# বাংলাদেশ

**তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা**

গরিব দেশের তালিকায় আর নয়, নয় তলাবিহীন ঝুড়ির তালিকায়ও। এমনকি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায়ও থাকছে না বাংলাদেশের নাম। বন্ধুরা, সকল শর্ত পূরণ করে জাতিসংঘের কাছ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সক্ষমতা অর্জন করার ঘোষণা পাওয়ার অপেক্ষায় আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ। ৪২ বছর স্বল্পোন্নত নিম্ন আয়ের দেশ (এলডিসি) থাকার পর চলতি মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সভায় বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল ও মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার স্বীকৃতি দেওয়া হবে। স্বাধীনতার পর দেশের উন্নয়ন ইতিহাসে এলডিসি থেকে উত্তরণ পর্বটি জাতীয় জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উত্তরণ ঘটেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে। আর তাই প্রিয় প্রধানমন্ত্রী এবং দেশবাসীর প্রতি নবারুণের পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক অভিবাদন।

একটি দেশের অভ্যন্তরে এক বছরে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজারে সামাজিক মূল্যই হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)। আগের বছরের তুলনায় পরের বছরে এ উৎপাদন যে হারে বাড়ে সেটি হচ্ছে জিডিপির প্রবৃদ্ধি। জিডিপি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উন্নয়ন নীতি বিষয়ক কমিটি (সিডিপি) প্রতি তিন বছর অন্তর এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। সিডিপি কর্মকর্তারা বাংলাদেশের এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়ে আলোচনা করতে গত অক্টোবরে ঢাকায় আসেন। প্রাথমিক হিসাব করে সিডিপি নিশ্চিত করেছে যে, বাংলাদেশে চলতি মার্চ মাসে তাদের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় মানদণ্ড পূরণ করবে। এরপর ২০২১ সালের পর্যালোচনায় সিডিপি বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে

উত্তরণের সুপারিশ করবে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অনুমোদন দেবে জাতিসংঘ।

এলডিসি থেকে উত্তরণের জন্য সিডিপি তিনটি সূচককে বিবেচনায় নেয়। এগুলো হচ্ছে- মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা।

কোনো দেশ তিনটি সূচকের যে-কোনো দুটিতে পরপর দুটি পর্যালোচনায় (৬ বছর) উত্তীর্ণ হলে তাকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘ। আর সবচেয়ে সুখের খবর হলো- এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশই প্রথম এলডিসি যে তিনটি সূচকেই শর্ত পূরণ করে উত্তরণের স্বীকৃতি পাচ্ছে। সিডিপির হিসাবে মাথাপিছু আয় ১২৪২ মার্কিন ডলার হতে হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলার। মানবসম্পদ সূচকে দেশের ৬৬ ভাগ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হতে হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ অর্জন ৭২ দশমিক ৯ ভাগ। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার মাত্রা ৩২ ভাগের নিচে হতে হয়। বাংলাদেশের এ মাত্রা ২৫ ভাগে রয়েছে।

ইতিমধ্যে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী এবং ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সিপ্পো বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আগাম অভিনন্দন বার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, উন্নয়নে বিশ্বে রোল মডেল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

এখন থেকে ৪৬ বছর আগে ১৯৭১ সালে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ। পাকিস্তানের আগ্রাসী থাবা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নের পথে এগোতে থাকে দেশটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানো। এরই মধ্যে দেশটি ধীরে ধীরে হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর ১৯৯৬ সালের প্রথম মেয়াদ এবং ২০০৯ সাল থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশের সকল স্তরে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের সকল সূচকে বাংলাদেশ এখন কেবলই সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ এখন সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত।

সম্প্রতি দ্য ইকোনোমিস্টের এক প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি তুলনা তুলে ধরা হয়। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশ পাকিস্তানের চাইতে অনেক কিছুতে এগিয়ে। ৪৬ বছরের অগ্রগতিতে বাংলাদেশের মাথাপিছু দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ এখন পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ ১ হাজার ৫৩৮ ডলার। যেখানে পাকিস্তানের মাথাপিছু জিডিপির পরিমাণ ১ হাজার ৪৭০ ডলার। একই সাথে পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় এখন ১ হাজার ৩৮০ ডলার আর বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৬০২ ডলার। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৩৩ বিলিয়ন ডলার যা পাকিস্তানের থেকে ১২ মিলিয়ন ডলার বেশি। ২০১৭ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ৮৮; যেখানে পাকিস্তানের ১০৬।

এছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ দশমিক ২৮ শতাংশ। দেশের অর্থনীতির ইতিহাসের এই প্রথম এত উচ্চমাত্রায় প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হলো। যা ছিল নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি।

১৯৭৩-৭৫ সালে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ২ দশমিক ৪ শতাংশ। এমনকি ১৯৯০ সাল পর্যন্ত গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৭ শতাংশ। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২ সালে সেটা ৩ গুণ বেড়ে হয় ১১৬ বিলিয়ন। সর্বশেষ টানা ছয় বছর ৬ শতাংশের উপরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা ১৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি বাংলাদেশের জন্য অনেক ইতিবাচক। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বাড়বে। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে। আরো বেশি হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথ সুগম হবে। তবে উত্তরণের সব পর্যায়েই কিছু চ্যালেঞ্জ থাকে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

# ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

## শিশুসাহিত্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র

**শাহানা আফরোজ**

নদীমাতৃক বাংলাদেশের সুনামগঞ্জ জেলার সুখাইর গ্রাম। অবারিত সবুজের মাঠ, ক্ষেত আর বিলে ঘেরা চারিদিক। মরমী সাধকের সুরের মায়াজাল আর পাখির কলতান নিত্যসঙ্গি। এমনই এক গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ঝর্ণা। মেয়েটির শৈশব কেটেছে বাবার লাইব্রেরি আর সংগৃহীত লেখার কোটেশনে পড়ে। ছোটো ভাইয়ের অকাল মৃত্যুর শোক ভুলতে বাবা বাড়িতে গড়ে তুলেছিলেন লাইব্রেরি আর গোলাপের বাগান। ফুল আর বই -এর ঘ্রাণ নিতে নিতে কখন যে ছোট্ট মেয়েটি নিজেকে সঁপে দিয়েছে লেখার মাঝে বুঝতেই পারেনি। ১৯৪৫ সালের ২৭ জুলাই জন্ম হলেও লেখা শুরু ৫৪/৫৫ সালের দিকে। শিশুসুলভ মন, প্রকৃতির নির্মল হাতছানি আর বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখতে লিখতে ছোট্ট মেয়েটি হয়ে যায় নামকরা শিশুসাহিত্যিক। বন্ধুরা তোমরা কি জানো সে মেয়েটির পুরো নাম কি। সেই মিষ্টি মেয়েটি হলো ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ, আমাদের ঝর্ণা দিদি।

নবারুণের সাথে ঝর্ণা দিদির বন্ধুত্ব বহুদিনের। সুসংবাদ হলো এ বছর বাংলা একাডেমি শিশুসাহিত্য -২০১৭ পুরস্কার পেয়েছেন ঝর্ণা দিদি। তাঁর এই আনন্দে ভাগিদার হয়ে নবারুণের সাথে হয়ে গেল পারিবারিক আড্ডা। আড্ডায় গল্প হলো, জানা হলো অনেক কিছু। গল্পের কিছু অংশ তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম।

নবারুণ: সংগীতপ্রেমী পরিবারের মেয়ে হয়ে লেখার জগতে কীভাবে এলেন ?

দিদি: মাঠ ভরা ধান, হলুদ সরষে ক্ষেত, পাখির উড়তে উড়তে কালো বিন্দু হয়ে যাওয়ার দৃশ্য আমার মনকে সবসময় দোলা দিত। আমি বই পড়তে ভালোবাসতাম। বই পড়তাম আর ভাবতাম লেখকরা কীভাবে লিখে। যদি আমি লিখতে পারতাম। আমার এই ভাবনাই আমাকে লেখার জগতে নিয়ে এল।

নবারুণ : পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্য বই পড়তে অভিভাবকরা বাধা দিতেন কি না ?

দিদি : বড়োরা শাসন করবে এটাই স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে মায়ের বকুনির ভয়ে পড়ার বইয়ের নিচে লুকিয়ে বই পড়তাম। তখনতো বই-ই ছিল বিনোদন আর জগতকে জানার একমাত্র অবলম্বন। শিক্ষকরাও পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের বই পড়ার পরামর্শ দিতেন।

নবারুণ : আপনার প্রথম লেখা কবে ছাপা হয়েছে ?

দিদি : ১৯৫৫ সালে সংবাদের খেলাঘর পাতায় আমার প্রথম গল্প 'বাদল দিনে' ছাপা হয়। এরপর বিভিন্ন বিখ্যাত পত্রিকার ছোটোদের পাতায় আমার লেখা ছাপা হতে থাকে। সিলেটের স্থানীয় জনশক্তি, যুগভেরি পত্রিকায়ও আমার লেখা ছাপা হয়েছে।

নবারুণ: কি দিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন?

দিদি: প্রথম প্রথম ছড়া লিখতাম। ছাপাও হতো। প্রথম ছড়া ছাপা হয় ধান শালিকের দেশ পত্রিকায়। কবিতাও লিখেছি, তবে কম। ১৯৭০ সালে করাচিতে একুশে ফেব্রুয়ারী কবিতা লিখে সম্মানিত হয়েছি।

নবারুণ : গল্প লেখা শুরু কীভাবে ?

দিদি : ছড়া -কবিতা লিখে ভাবতাম এত কম শব্দে আমি আমার মনের সব কথা প্রকাশ করতে পারছি না। আমার আরেকটু জায়গা দরকার। আরেকটু বেশি

লিখি। এ বাসনা থেকেই গল্প লেখা শুরু।

নবারুণ : শিশুসাহিত্যে আগ্রহী হলেন কীভাবে ?

দিদি : স্বাধীনতার পর ১৯৭৬ সালে শিশু সংগঠন খেলাঘরের সাথে যুক্ত হলাম। তখন পাক্ষিক আসর বসতো খেলাঘরে। ছোটো-বড়ো সকলেই আসতো এই আসরে। নিজ নিজ লেখা পড়তো। প্রধান অতিথি হিসেবে থাকতো একজন শিশুসাহিত্যিক। বেশিরভাগ আসর পরিচালনা করতাম আমি। সেখানে লেখা নিয়ে আলোচনা হতো। এভাবেই শিশুদের বৃত্তে জড়িয়ে গেলাম। তাছাড়া অনেকেই বড়োদের জন্য লিখে। শিশুদের জন্য লিখে না। সংগঠনে অনেক শিশুই নানা রকম প্রশ্ন করত। তাদের বিচিত্র ভাবনার মুখোমুখি হতাম আমি। শিশুদের মনের কথা আর সুপ্ত বাসনাগুলোকে আমার গল্পে রূপ দিতে লাগলাম। এভাবেই আমার শিশুসাহিত্যে পথ চলা শুরু।

নবারুণ : আপনার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ কোনটি ?

দিদি : একটি ছোট গল্প সংকলন। নাম গোধূলীর রং লেখা। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয়।

ছড়া দিয়ে লেখক জীবন শুরু করলেও বড়ো গল্প, ছোটো গল্প, উপন্যাস, মুক্তিযুদ্ধের গল্প, শিশুসাহিত্য সব শাখাতেই ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ সফল। মা গান জানতেন তাই মায়ের কাছে গানের তালিম নিতে হতো। মায়ের শিক্ষা বিফলে যায়নি দিদির। পরবর্তীতে সফল গীতিকার হিসেবে তাঁর গান টিভি-রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে।

নবারুণ : আপনার স্মৃতিতে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে চাই ?

দিদি : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের করাচিতে ছিলাম। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম। না জানি কি হয়। বিজয়ের খবরটা জানার পরও ভয়ে আনন্দ করতে পারিনি। মন খুলে হাসতে পারিনি। এরপর পালিয়ে কোয়েটা, কান্দাহার, কাবুল হয়ে স্বাধীন দেশে ফিরে আসি ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে।

নবারুণের জন্মলগ্ন থেকেই লিখছেন লেখিকা ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ। সেই সূত্র ধরে নবারুণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বলেন, নবারুণ আমার প্রিয় পত্রিকা। আমি শিশুদের জন্য লিখতে পছন্দ করি। তাই এখানে লিখতে ভালো লাগে। মনের আনন্দে লিখি। শুরু থেকেই পত্রিকাটির মান ভালো। এখন আরোও পরিধি বেড়েছে। সাহিত্যের পাশাপাশি অনেক তথ্য থাকে।

নবারুণ : শিশুসাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার পর আপনার অনুভূতি কি ?

দিদি : যে-কোনো পুরস্কার পেলে ভালো লাগে। তবে দায়িত্ব বেড়ে যায়। মনে হয় এ পুরস্কারের মান রাখতে হবে। আরো ভালো কিছু লিখতে হবে। নতুন লেখার ক্ষেত্রে পুরস্কার টনিকের মতো কাজ করে।

পঞ্চাশ দশক থেকে আজ পর্যন্ত লিখে যাচ্ছেন ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ। তার এই লেখালেখির জীবনে পুরস্কারও পেয়েছেন অনেক। সাজিদুন্নিসা খাতুন চৌধুরী সাহিত্য পদক-১৪০১, কবি সংসদ বাংলাদেশ পদক (শিশু সাহিত্য) ২০০৪, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক-১৯৯৬, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার-১৪১০, বাংলা একাডেমী শিশুসাহিত্য পুরস্কার-২০১৭ সহ আরও অনেক পুরস্কার। সম্মাননা পেয়েছেন শিরী শিশুসাহিত্য কেন্দ্র থেকে-১৯৯৩ সালে। ২০১০ সালে পশ্চিম বঙ্গ দিয়েছে বাংলা একাডেমী সংবর্ধনা। রাগশ্রী শিল্পী গোষ্ঠী বিজয় দিবস (১৯৯২) উপলক্ষে দিয়েছে প্রত্যয়নপত্র। এছাড়াও পেয়েছেন আরো অনেক অনেক সম্মাননা।

নবারুণ: লেখালেখি ছাড়া এখন কোনো সংঘটনের সাথে যুক্ত আছেন ?

দিদি: কচিকাঁচার আসর, খেলাঘরের সাথে যুক্ত ছিলাম অনেকদিন। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের সদস্য হই। আজও আছি সহসভাপতি হিসেবে।

নবারুণ : নবারুণ শিশু-কিশোর বন্ধুদের জন্য কিছু বলুন?

দিদি : বন্ধুরা মা-বাবাকে সবসময় ভালোবাসবে, সবকিছু তাদের সাথে শেয়ার করবে। বড়োদের সম্মান করবে, সৎ থাকার চেষ্টা করবে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। বিনয়ের সাথে চলবে, আর বেশি বেশি বই পড়বে।

গল্পে গল্পে সময় গড়িয়ে যায়। বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে গেলেও ফিরে আসি সুন্দর কিছু মুহূর্ত নিয়ে । যা আমাদের চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

আড্ডার সাথি ছিল তানিয়া ইয়াসমিন, মেজবাউল হক ও সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি।

গল্প

# বাটা ভরা রহস্য

শরীফ খান

**তেঁতুল পাকে চৈত্রে।**

ওই পাকা তেঁতুল পাড়তে রামদের গাছে চড়েছে বিশু। রামের বন্ধু সে। গাছে ভালো চড়তে পারে বলেই রাম তাকে ডেকে এনেছে তেঁতুল পাড়তে। মস্ত বড়ো গাছ। বিশু এ ডালে-ও ডালে যাচ্ছে অনেকটাই হনুমানের মতো, ডালে ঝাঁকুনি তুলছে ঝড়ের বেগে, হাতের লগিটা দিয়েও টেনে টেনে তেঁতুল ফেলছে গাছতলায়। তেঁতুল মাটিতে পড়তেই খোসা ফেটে যাচ্ছে বিচিত্র শব্দে। তেঁতুল কুড়িয়ে ডালা-ধামায় রাখছে রামের ছোটো বোন শিপ্রা, রাম ও ওদের মা। ওদের ঠাকুরদা দাঁড়ান পাশেই। ঠাকুরমাও কুড়াচ্ছেন তেঁতুল।

গাছটি ঠাকুরদার বয়সি গাছ। পাকিস্তান আমলে এই গাছের মাথায় ছিল শকুনের স্থায়ী বাসা। শকুনের ডিম ফুটতে নাকি কী একটা মহামূল্যবান হীরক-পাথর লাগে। শকুনেরা ভারতের আন্দামান দ্বীপ থেকে সেই পাথর এনে বাসায় ডিমের পাশে রাখত। ওই পাথরের

ছোঁয়া না পেলে শকুনের ডিম ফুটে ছানা হয় না! সেই অলৌকিক পরশ পাথরের লোভে রামের ঠাকুরদাও বাল্য-কৈশোরে বেশ কবার চড়েছিল শকুনের বাসায়।

গাছটার ঠিক সেই পয়েন্টেই, যেখানে বাসা করেছিল শকুনেরা, এখন বাসা করে বছর বছর ছানা তোলে এক জোড়া মেছো ঈগল। মাচানের মতো বাসা। বছর বছর উপকরণ, গাছের ডালপালা এনে ওরা একেবারে লাকড়ির আড়ত যেন বানিয়ে ফেলেছে।

বিশু ওই বাসাটির মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে লগি দিয়ে তেঁতুল পাড়তে পাড়তে চিৎকার দিল, ও রাম! শিপ্রারে! ঠাকুরদার কাছে শোন তো, ঈগলের বাসাটা ভেঙে দেবো কিনা! গাছের তো বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে ওরা। দু-এক বছরের মধ্যে মরে যাবে এই গাছটা।

রাম-শিপ্রার জবাবের আগেই উপরের দিকে তাকিয়ে ওদের ঠাকুরমা বললেন, ভেঙে দেরে বিশু ভেঙে দে। কার্তিক মাসে ওরা ছানা ফোটায়। পুকুরের রুই-কাতলা সব শেষ করে দেয়। ভেঙে দে, ভেঙে দে।

ঠাকুরদা ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভেঙে দিলে যদি অমঙ্গল হয়, ভগবান যদি ...!

গাছটা মরে গেলে তখন কী হবে গো। ও শিপ্রার ঠাকুরদা, অ্যা! কার্তিক মাসে কী পরিমাণ মাছ গেলে, তা কী জানেন না আপনি? বছরে তেঁতুল বিক্রি হয় ৩/৪ মন। প্রতি কেজি তেঁতুল ৬০ টাকা। গাছটা মরে গেলে এতগুলো টাকা ঘরে আসবে? নিজের তো আবার তেঁতুলের আচার না হলে খাবার রোচে না!

এটুকু বলেই ঠাকুরমা চেঁচিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরে ও বিশু। ভেঙে দে বাসা। আপদ বিদেয় কর।

## দুই

এই তল্লাটের মনসা দেবির স্থায়ী পুজোর স্থল 'মনসাখোলা' একটি অশ্বত্থ তলায়। বিশাল মাঠের ভেতর অশ্বত্থ গাছটা, একটি পরিত্যক্ত দিঘির উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ডালপালা মেলে রাজার মতো। শোনা যায়, দিঘিটা কাটিয়েছিলেন সেই পাঁচ-ছশো বছর আগে পীর খানজাহান আলী। এক রাতের ভেতর জ্বীন-ভূত-দৈত্য ও পরিদের দিয়ে এলাকার জলকষ্ট দূর করার জন্য। বাগেরহাটের খাঞ্জালি দিঘির কুমিরের মতো এখানে তিনি কুমির ছাড়েননি। এই দিঘিটিতে দুষ্টু জিন-পরিদের অজগর সাপ বানিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। সেই অজগররা মানুষ-গরু-ছাগল সবই গিলত। তাই, এলাকার লোকজন ভয়ে ওই দিঘিতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। দিঘিটার জল পচা রক্তের মতো কালো। জল থাকে বারো মাস বুক সমান।

বাগেরহাট শহরের খাঞ্জালি দিঘির উঁচু উঁচু চারটি পাড়ের মাটির তলায় লুকানো সোনার মোহর ভর্তি লোটা-ঘটির মতো মোহর ভর্তি লোটা-ঘটি এই দিঘিটার চারপাড়েও ছিল। পীর খানজাহান আলী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে এই তল্লাটের কিছু মানুষকে দু-একটি লোটা-ঘটির সন্ধান বলে দিতেন, তারা কোদাল দিয়ে পাড়ের মাটি খুঁড়ে মোহর ভরা লোটা বা ঘটি পেয়ে রাতারাতি মস্ত বড়ো ধনী হয়ে গিয়েছিল। খাঞ্জালি দিঘির পাড় ঘিরে এই বিশ্বাস অটুট আজও। ছদ্মবেশী পীর সাহেব নাকি পুরো বাগেরহাট জেলার গ্রাম-গঞ্জ-শহর-বন্দরে ঘুরে বেড়ান, পরখ করেন তার ভক্তরা আজও তার উপরে কতটা আস্থা রাখে! বিশ্বাস রাখেই বা কতটা!

বালক বিশুদাসের এক ঠাকুরদার ঠাকুরদা একবার ছদ্মবেশী 'গুঁইসাপ বাবা'–কে অনেক সেবাযত্ন করে। দিন ও রাতে খাঁটি সরষে তেল দিয়ে গুঁইসাপ বাবার পা মেজে দিয়ে জয় করে ফেলেছিলেন 'গুঁইসাপ বাবা' রূপি পীর খানজাহান আলীকে। এক পূর্ণিমা রাতে গুঁইসাপ বাবা সেই ঠাকুরদাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন বর্তমানের পরিত্যক্ত দিঘিটার পাড়ে। দেখিয়েছিলেন গুপ্তধনের স্থান। সেই ঠাকুরদা ধুতিতে মালকোঁচা এঁটে কোদাল দিয়ে ৫ হাত মাটি খুঁড়ে পেয়েছিলেন দু ঘটি মোহর। গুঁইসাপ বাবা ওই গর্ত নিজ হাতে ভরাট করে দিয়েছিলেন, যাতে অন্য কেউ টের না পায় যে, এখান থেকে মোহর ভরা লোটা-ঘটি তোলা হয়েছে। তাহলে লোভে পড়ে মানুষজন দিঘির চার পাড়ই খুঁড়ে ফেলবে।

গর্ত ভরাট করে গুঁইসাপ বাবা সেই ঠাকুরদাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সাবধান কেষ্ট দাস! যদি তোর মঙ্গল চাস! তোর পরবর্তী বংশধরদের সর্বনাশ করতে না চাস, তাহলে মোহরের কথা বলবি না কাউকেই। মহামূল্যবান মোহর এগুলো। বিক্রি করবি সোজা কলকাতা শহরে গিয়ে গঙ্গারাম পোদ্দারের সোনার দোকানে। সে তোকে ঠকাবে না। ওই অর্থ দিয়ে তোর চৌদ্দপুরুষ বসে বসে সুখের জীবন কাটাতে পারবে রে! ইচ্ছে করলে তাল্লুক-মুল্লুক কিনে জমিদারিও করতে পারবি, হতে পারবি মস্ত বড়ো জমিদার। হাতি

থাকবে, ঘোড়া থাকবে, সাত বেহারার রূপোর পালকি থাকবে। তোর সেবাযত্নে খুশি হয়ে আমি তোকে মস্ত বড়ো একটা সুযোগ দিয়ে গেলাম রে!

একটু থেমে গুঁইসাপ বাবা বলেছিলেন আবার, বাবা কেষ্ট! কষ্ট করেই কেষ্ট মেলে। কষ্টের সেই কেষ্টকে তুই লোভে পড়ে নষ্ট করিস না যেন! বাবা কেষ্ট দাস, আরো যদি মোহর চাস। অপেক্ষা করবি আরো বছর কয়েক। সেটা হতে পারে এক বছর। হতে পারে ৫০/১০০ বছর পরেও। তখন আসব আমি টিকিবাবার বেশ ধরে। বুঝলি তো কেষ্ট দাস! আমার চুল থাকবে লম্বা। সেই চুলের আগায় জটা পড়বে। জটাটা রাবারের খেলনা বলের মতো গোল দেখাবে। আসলে ওটা হলো টিকি। টিকিবলও বলা যাবে। তখন আমাকে চিনলে আসিস, করিস সেবাযত্ন, দেবো তখন আরো চার ঘড়া মোহর।

তুই না পাস, তোর বংশেরই কেউ পাবে তো! আমি তখন তোর কোনো বংশধরকেই মোহর ভরা ঘড়া দেবো। বুঝেছিস তো?

কেষ্ট দাস একেবারে গদগদ কণ্ঠে বলেছিলেন, বুঝেছি গুঁইসাপ বাবা!

ভয়ে ঘাবড়ে গিয়ে থরথর করে কাঁপছেন তখন বৃদ্ধ কেষ্ট দাস। গুঁইসাপ বাবা তখন কেষ্টদাসের মাথার চাঁদিতে ডান থাবার প্রচণ্ড থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন, লোভ করবি না। এই দিঘির চার পাড়ের মাটির তলাতেই এরকম মোহর ভর্তি লোটা-ঘটি আছে অফুরন্ত। আমার ভক্তরা প্রতি বছরই দু-চার ঘটি পায়, ভবিষ্যতেও পাবে। তোকে দু ঘটি দিলাম। আর খুঁজবি না এই সর্বনাশা গুপ্তধন। খুঁজতে এলেই কিন্তু বদ্ধ পাগল হয়ে যাবি। ন্যাংটো পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবি। মরবি না সহজে। আর, তোর এই দু ঘটি আসল সোনার মোহর তখন পেতলের মোহর হয়ে যাবে। হাতে পেয়ে ধন হারাসনে রে কেষ্ট দাস!

জ্বি, পীরবাবা। মনে থাকবে আপনার সব নির্দেশ-উপদেশ।

তাহলে দে এবার আমার সেলামি। বউয়ের ৩০ ভরি সোনার গয়নার সবটুকুই এনেছিস তো! নাকি আবার নাকফুল-টিকলি আর কানের দুল-টুল রেখে দিয়েছিস?

রাম রাম বাবা! গুঁইসাপ বাবা! ৩০ ভরিই আছে। নেন।

সাদা কাপড়ে পুঁটলি করে বাঁধা ৩০ ভরি সোনার গয়না গুইসাপ বাবা হাতের তালুতে রেখে উপর-নিচ করে নাড়াচাড়া করে বুঝলেন, ৩০ ভরিই আছে।

ঘাড়ে ঝুলানো মস্ত বড়ো কালো কাপড়ের থলেতে সোনা চালান করে দিয়ে বললেন, বিদায় এবার। দু-চারদিন বাদে কলকাতা যাস। সাবধান! কলকাতার সোনার দোকানে যাবার এক মুহূর্ত আগেও ঘটি থেকে বার করবি না একটিও মোহর! ঘটির মুখ তো পেতল দিয়েই শক্ত করে ঝালাই করা আছে। গঙ্গারাম পোদ্দারই ঝালাই খুলতে পারবে। ভালো কথা। কঠোরভাবে গোপন রাখবি সবকিছু। তোর পরিবারের দু-চারজন বাদে বলবি না আর কাউকে। আর, আমি তো আসছি আবার টিকিবাবা রূপে।

লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু বা চরম শাস্তি। তবুও লোভে পড়ে সেই বৃদ্ধ কেষ্টদাস তিনরাত পরে কোদাল হাতে ওই দিঘির পাড়ের মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন আরো ঘড়ার লোভে।

যেখান থেকে পেয়েছিলেন তিনি দু ঘড়া, তার হাত দশেক দূরে পেলেন একটি মাত্র ঘড়া। ওটা ধুতির আঁচলে ঢেকে বুকে চেপে নিয়ে এলেন বাড়িতে।

ভালো দিনক্ষণ দেখে রওয়ানা দিলেন একদিন কলকাতার উদ্দেশ্যে।

বাগেরহাট থেকে রেলপথে খুলনা-দর্শনা হয়ে সোজা কলকাতায়। সেখান থেকে সেই বিখ্যাত গঙ্গারাম পোদ্দারের বিখ্যাত সোনার দোকানে। গঙ্গারাম পোদ্দারের বয়স ৯০ বছরের বেশি। পাকা জহুরি তিনি। প্রথম দুটি ঘড়ার মুখের ঝালাই ভেঙে তিনি দুটি ঘড়ার মোট ২০০ মুদ্রাকে পরখ করেই গোপনে এক দোকান কর্মচারীকে পাঠালেন লালবাজার থানায়। ইংরেজ দারোগা-পুলিশরা এসেই কেষ্ট দাসের কোমরে দড়ি বেঁধে ফেলল। অপরাধ গুরুতর। পেতলের মোহর এনেছে সোনার মোহর বলে বিক্রি করতে! প্রতারণা মামলা! কেষ্ট দাসের চোখে তখন সর্ষেফুল। মাথার ভেতরে লক্ষ মৌমাছির মহাগুঞ্জন। পীর বাবার কথাই ফলে গেছে! পাপের ফল। দু ঘড়া সোনার মোহরই পেতলের মোহর হয়ে গেছে তাঁর নির্দেশ অমান্য করে লোভে পড়ার কারণে, কিন্তু তৃতীয় ঘটি বা ঘড়াটা ভরা কিন্তু আসল সোনার মোহরই পাওয়া গেল। যেটা কেষ্ট দাস রাতের আঁধারে গোপনে তুলেছিলেন। পীরবাবা কেন যেন ওগুলোকে আর পেতল করেননি।

মোহরগুলোর গায়ে খোদিত মনোগ্রাম ও সাল দেখে ইংরেজ দারোগা নিশ্চিত করল, খান জাহানের আমলেরই স্বর্ণমুদ্রা এগুলো। প্রতিটা মোহরের ওজন ৩ ভরি করে। এবার ভিমরি খেয়ে বসে পড়লেন কেষ্ট দাস! এই ঘড়াটার মোহরও তো পেতলের হয়ে যাওয়ার কথা! ইংরেজ দারোগা তখন মাটিতে বসা কেষ্ট দাসকে টেনে তুলে দেখালো তিনটি ঘটিকেই, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। প্রথম দুটিতে কোনো সীলমোহর বা চিহ্ন নেই। এ ঘটি দুটি আকারে-গড়নে ও ধরনে তৃতীয় ঘটিটার সঙ্গে মেলে না। তৃতীয় ঘটিটার গায়ে আরবিতে স্পষ্ট সীলমোহর ও সাল-তারিখ লেখা আছে।

এতক্ষণে কেষ্ট দাস হুঁশ হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল গঙ্গারাম পোদ্দারের দোকানের মেঝেতে। সঙ্গে যাওয়া তরুণ বয়সি ভাইপো বলরাম দাস টেনে তুলল তার ঠাকুরদাকে। ওই বলরাম দাসই ছিল আজকের বালক বিশুদাসের দাদাঠাকুর।

বিশুদাস বংশ পরম্পরায় ওই করুণ-রোমাঞ্চকর ইতিহাস জানে খুব ভালোভাবে। আসল মোহরগুলো সেদিন সরকারি সম্পদ বলে জব্দ করেছিল সেই ইংরেজ দারোগা। নকলগুলোর জন্য কেষ্ট দাসের সাজা হয়েছিল ৫ বছর। ৫ বছর বাদে বলরাম দাসই কলকাতায় গিয়ে ঠাকুরদা কেষ্ট দাসকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। বাড়িতে আসার দিন দুই বাদে একেবারে ন্যাংটো-বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। দাস বংশের দু-চারজন বয়সিরা খবর জানলেও গ্রামের কেউ কিছু কিন্তু জানতে পারেনি। জানেনি জেল জীবন ও নকল-আসল মোহরের খবর। গ্রামের সবাই জানত, কেষ্ট দাস কলকাতায় কাপড়ের ব্যবসা করে। কলকাতা শহরে তার দুটি কাপড়ের দোকান। গ্রামে ফিরে পাগল হবার পরে সবাই জানল, দুটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হওয়া ও নগদ ৬৫ হাজার টাকা ক্যাশবাক্সসহ পুড়ে ছাই হবার কারণে শোকে কেষ্ট দাস পাগল হয়ে গেছে। দাস বংশের সব জানা সেই বয়সিরা সত্যটা লুকালো খুব কৌশল ও সাবধানে। সত্য ফাঁস হলে সর্বনাশ। পীরের অভিশাপে হতে পারে বংশনাশ!

শত বছর বাদেও বিশুদাস মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সেই গুঁইসাপ বাবার নিষেধ অমান্য করার জন্যই কেষ্ট দাসের দু ঘড়া মোহর পিতল হয়ে গিয়েছিল। ন্যাংটো-বদ্ধ পাগলও হয়েছিলেন একই কারণে।

## তিন

এক ভোরে দেখা গেল মাঠ পাড়ি দিয়ে একজন শ্বেতবালক ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে ওই দিঘিটার দিকে। মাঠে কর্মরত কৃষিজীবীরা চরম কৌতূহলে ওই বালকের পিছু নিল। মাথার পেছন দিকের লম্বা জটাওয়ালা চুলগুলো দিয়ে একটি সাদা টেনিস বল যেন তৈরি করে নিয়েছে বালক। হাঁটার তালে তালে ওই টেনিস বলটা ঘাড়-পিঠে লাফাচ্ছে চমৎকার ভঙ্গিতে। চুলের মাথায় গিঁট দিয়ে বানিয়েছে সে টিকি সদৃশ্য বলটি। শ্বেতবালক বসল একটা মহুয়া গাছের তলায়। চোখে ওর লাল কাচের সানগ্লাস। সারা শরীর তো সাদাই,সাদা ওর মাথার তালুসহ পায়ের তালুও।

একজন বয়সি কৃষক সাহস করে প্রশ্ন করল, বাবা তুমি কে?

বালক হেসে বলল, কে আমি, তা আমি নিজেই জানি না। শ্বেতি রোগী আমি। স্বপ্নে আমি এই পচা দিঘিটাকে দেখেছি। সাদা পোশাকধারী এক দরবেশ নিজেকে পীর খানজাহান আলী পরিচয় দিয়ে বলেছেন, পরপর একমাস দিনে ও রাতে এই পুকুরে ডুব দিয়ে গোসল করলে সেরে যাবে আমার শ্বেতরোগ।

তা ভালো, কিন্তু এই দিঘিতে যে বড়ো বড়ো বোয়াল

মাছ আছে! ঢেঁকির মতো বড়ো বড়ো গজার মাছ আছে। ওগুলো নাকি খানজাহানের সেই অভিশপ্ত অজগর সাপ। ওরাই পরে বোয়াল ভূত ও গজার ভূত হয়ে গেছে।

শ্বেতবালক ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ঝুলিয়ে বলল, তাতে আমার কী, অ্যা! পীরের নির্দেশে এসেছি। ওরা বেয়াদবি করলে খানজাহান ওদেরকে পানাব্যাঙ বানিয়ে ফেলবেন। তখন দিনরাত ঘ্যাঙ ঘ্যাঙ করবে।

গত বছর কিন্তু কুকুরের তাড়া খেয়ে দিশেহারা দুটি পাতিশিয়াল লাফিয়ে পড়েছিল এই দিঘিতে। দেখতে না দেখতে ওদের গিলে নিয়েছিল একজোড়া গজার মাছে।

শ্বেতবালক এবার হাসল শুধু। তাচ্ছিল্যের হাসি, বলল না কিছু।

দিঘির পাড়ের বড়ো বড়ো এই বট-পাকুড়-অশ্বত্থ গাছে কিন্তু ভূত-পরি আর দৈত্য-দানব আছে। ঝোপঝাড়ে সাপখোপের আড্ডা।

শ্বেতবালক এবার হুংকার ছাড়ল, জয় বাবা খানজাহান!

পুরো তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। মানুষ আসতে লাগল দলে দলে। নারী-শিশু-পুরুষ-হিন্দু- মুসলমান। পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাই দেখে শ্বেতবালকের অবাক ডুবসাঁতার। রাম-বিশুও পরপর গেল কদিন। অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস, পীর সাহেব এবার সাদা শরীর ধারণ করে টিকিবাবা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু বিশু ও বিশুর মা-বাবা ছাড়া দাস পরিবারে তো তুমুল উত্তেজনা! সেই এক পূর্বপুরুষ কেষ্ট দাসই বলেছিলেন, একদিন টিকিবাবা আসবেন। দেবেন আরো চার ঘড়া মোহর! এতদিনে এসেছেন সেই টিকিবাবা! দাস বংশের কাউকে না কাউকে দেবেন এবার চার ঘড়া মোহর।

## চার

দুরন্ত-দুঃসাহসী বালক রাম। সাধু-সন্ন্যাসী বা ফকির-দরবেশে তার কোনোই বিশ্বাস নেই। তার বন্ধু দাসপাড়ার দস্যি বালক বিশুরও তা নেই। দুজনেই ভূতে ঘোর অবিশ্বাসী। তাই তো বুঝি দুজনের বন্ধুত্ব একটু অন্যরকম।

একরাতে চরম কৌতূহলবশত রাম একাকী চলে এল দিঘির পাড়ে। মনে তার ঘোর রহস্যের উঁকিঝুঁকি। এই পচা জলে স্নান করে ভালো হয়ে যাবে ওই শ্বেত বালক! নাকি ওর সাদা চামড়া পচে খসে পড়বে! দেখা যাক, রাতে শ্বেতবালক কী করে!

একটা গাব গাছে চড়ে বসল সে চুপিসারে। চাঁদ আছে পূর্বাকাশে। একেবারে বড়োসড়ো চাঁদ, কিন্তু গাছের জন্য দিঘির জলে পড়তে পারেনি আলো। তবুও তারার আলোয় রামের মনে হলো, দুটো ভূত দিঘির মাঝখানটায় ডুবোডুবি করছে। কালো কালো লাগছে ওদের। ভূত তো নয়ই, মানুষ ওরা। একজন শ্বেতবালক, অন্যজন কে! উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছে রাম। ঘামের বিন্দু জমছে মুখমণ্ডলে।

মাঝরাতে চাঁদ যখন উঠে এল দিঘির পূর্ব পাড়ের গাছপালার মাথার উপরে, তখন শ্বেতবালকের সঙ্গে সে তার বন্ধু বিশুকে দেখে চমকে গেল। বিশু! শ্বেতবালকের সঙ্গে বিশু কেন ডুব দিচ্ছে দিঘির জলে হন্যে হয়ে খুঁজছে যেন কিছু! রামের মাথার ভেতরে একটা জটাজাল যেন তৈরি হয়ে গেল। বিশু কেন এত রাতে শ্বেতবালকের সঙ্গে! পাগলের মতো ডুব দিয়ে দিয়ে কী খুঁজছে ওরা! একটা বাঁশের লগি জলের তলায় ঢুকিয়ে বার বার টেনে আনছে নিজেদের দিকে! আবারো লগিটা অন্যদিকে ফেলে টানছে নিজেদের দিকে।

ভোরবেলায় রাম গেল তার ঠাকুরদার কাছে। রামের সব কথা শুনে তিনি শোয়া থেকে উঠে বসে বললেন,

**তো সেই রাতে গাছে চড়ে বাড়ি এনে খুলে দেখে একটি কারুকাজ খচিত রুপার পানের বাটা! বাবার সাহায্যে হাতুড়িপেটা করে বাটা বা ডিব্বাটা ভেঙে ভেতরে পায় একখানা হাতে লেখা চিঠি।**

রাম রাম! বলছিস কী তুই, অ্যা! ব্যাপারটা তো এখন ঘোর রহস্যময় মনে হচ্ছে! ওরে ও রাম, ওই শ্বেতবালককে দেখে আমার মনে হয়েছে, রহস্যময় এক বালক ও। কিন্তু, বিশু ওর সঙ্গে জোট বাঁধল কেন? শোন রাম, আমার তো মনে হচ্ছে, দিঘির জলে পীর খানজাহান আলীর কোনো মহামূল্যবান গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে ওরা! মোহর ভরা সিঁদুর কাঠের সিন্দুকও হতে পারে! আর, বাঁশের লগিটার মাথায় আছে ৬টি লোহার আঁকশি। ওই যে, দেখিসনি তুই হারানো জিনিস খোঁজা ডুবুরি পার্টিকে, ওই যে, যারা বাঁশের আগায় আঁকশি জুড়ে ঘাড়ে ফেলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে হাঁক ছাড়ে, 'এই হারানো জিনিস খুঁজি আমরা, পুকুর-দিঘিতে সোনা-রূপার আংটি-চেইন হারালে ডুব দিয়ে খুঁজে দিই, চামচ-পিরিচ-পেতলের হাঁড়ি-কড়াই তুলে দিই।' ওরাই তো ব্যবহার করে আঁকশি।

রাম বলল, ওরা তো আঁকশি টেনে জলকাদা একটা বাঁশের ডালায় রাখে, তারপরে জলে ডালা ঝাঁকিয়ে জলকাদা ফেলে হারানো জিনিস খোঁজে! দাদা! তাহলে বিশু আর ওই শ্বেতবালক কী মোহর খুঁজছে নাকি!

ঠাকুরদা বললেন, আমার তো তাই মনে হচ্ছে। শ্বেতবালকরূপী ওই পীর খানজাহান আলী কী তাহলে শ্বেতবালককে হীরে-জহরত তুলে দিচ্ছেন নাকি! ও রাম! তুই লেগে থাক। বড়োই রহস্যময় ব্যাপার রে!

রাম বলল, দাদা! শ্বেতবালককে তো সাধারণ মানুষ মনে করছে টিকিবাবা। পীর খানজাহান আলী নাকি যুগে যুগে বাগেরহাট এলাকায় এসে ছদ্মবেশ ধারণ করে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, আর দেখেন যে, আজও তাকে কেমন ভক্তি-শ্রদ্ধা করে এলাকার লোকজন!

দূর্ দূর্! একেবারে ভণ্ডামি কথা সব, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। শোন ও রাম, আমি আমার জীবনে এরকম চারজন বাবাকে দেখেছি। ভণ্ড, সবাই ভণ্ড। অন্ধবিশ্বাসী মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে এরা উদ্দেশ্য হাসিল করে কেটে পড়ে। শোন রাম, কথাটা আপাতত আর বলিস না কাউকে, বিশুকেও বলবি না কিচ্ছুটি। এই রহস্য আমরা দুজনেই ভেদ করে ফেলব।

রাম নিজের ঘরে এল। মাথার চক্কর তার কাটতে চাইছে না কিছুতেই। পুকুরে নেমে কী খোঁজে ওরা হন্যে হয়ে! রাতে নামছে এই জন্য যে, ভূতপ্রেতের ভয়ে রাতে এই দিঘির পাড়ের আশপাশে কোনো মানুষই আসে না! আর, দিঘির জলে তো এক বিন্দুও অক্সিজেন নেই। মাছ-ব্যাঙ-সাপ-জলজোঁক কিছুই বাঁচে না ওই জলে। কত কাল ধরে কোনো জলজ প্রাণী, এমনকি জলমাকড়সাও নেই। তবুও তল্লাটের প্রায় সব মানুষই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, দিঘিতে আছে ঢেঁকির মতো বড়ো বড়ো গজার মাছ। হাঙরের মতো বোয়াল মাছ। কোনো প্রাণী ওই দিঘির পাড়ে গেলেও নাকি গজাল-বোয়ালরা লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠে ছাগল-বাছুর-শিয়াল ধরে আবার উলটো লাফিয়ে পড়ে দিঘির জলে। ওদেরকে মারার কথা চিন্তাও করে না কেউ। তাহলে পীরের অভিশাপে হন্তাকারীর বংশই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আসলে সবই কুসংস্কার, ঘোর অন্ধবিশ্বাস। এ নিয়ে যে কত আজগুবি আজগুবি গল্প প্রচলিত আছে এলাকায়! শ'দুই বছর আগে চারটি গজারে নাকি জলপানরত একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে পাকড়াও করে জলে ফেলেছিল খেয়ে ফেলেছিল খুবলে খুবলে। তখন তো এই তল্লাটে বাঘ-চিতাবাঘ ছিল।

অস্থির রাম ঘর থেকে উঠোনে নামে। যুগে যুগে এই এলাকায় কুমির বাবা, বিড়াল বাবা, গুঁইসাপ বাবা সহ আরো কত বাবা এসেছে! সবাই ভণ্ডামি করে লোক ঠকিয়ে টাকাপয়সা ও সোনাদানা হাতিয়ে কেটে পড়েছে।

ওদিকে বিশুর মা-বাবা সেই রামদের তেঁতুল পাড়া দিন থেকে আজ পর্যন্ত বিশুর মুখে সব ঘটনা শুনে দারুণ পরামর্শ আগেই দিয়ে রেখেছেন। ঠাকুরমা তো বিশ্বাস করেই বসে আছেন যে, বহু বছর বাদে এসেছেন সেই টিকিবাবা, এবার হয়ে যাবে সব ক্ষতিপূরণ। কেননা, সেই এক পূর্বপুরুষ কেষ্ট দাস- যার দুঘড়া সোনার মোহর পেতল হয়ে গিয়েছিল। গুইসাপ বাবার কথা অমান্য করায়, এক ঘড়া খাঁটি সোনার মোহরও জব্দ

করেছিল ইংরেজ সরকার, যেতে হয়েছিল কলকাতার জেলে। সেই ৩০০ ভরি খাঁটি সোনার মোহরের কিছুটা হলেও ক্ষতিপূরণ যদি করিয়ে দেন এবার ভগবান! টিকিবাবা যেন সফল হয়। তাহলে ভাগ্য খুলে যাবে এই দাস পরিবারের। চার ঘড়া মোহর! দাস বংশের কেউই পেয়ে যাবে। বিশু ও তার মা-বাবার মাথায় কিন্তু অন্য চিন্তা।

## পাঁচ

পরপর সাত রাত রাম বলতে গেলে একাই দিঘির পাড়ের ঝোপে বসে পর্যবেক্ষণ করল বিশু-শ্বেতবালকের কর্মকাণ্ড। অবশ্য পালা করে নজরদারি করলেন রামের কাকা-জ্যাঠারাও। সবাই ওই সাঁতরাতেই বিশুকে শ্বেতবালকের সঙ্গে পুকুরে নেমে ডুব দিতে দেখল। হন্যে হয়ে কিছু যেন খুঁজছে ওরা! বিশু এখানে কেন? ওর তো আর শ্বেতিরোগ নেই। লগি-আঁচড়া টেনে আর ডুব দিয়ে দিয়ে পাগলের মতো কী খুঁজছে ওরা!

অষ্টম রাতে চাঁদের আলোর বন্যায় যেন ভেসে যাচ্ছে চরাচর। বৌদ্ধ পূর্ণিমাত আজ! ঠাকুরদা একটি প্রবল সম্ভাবনার কথা বলে দিয়েছেন রামকে। রাম চড়ে বসেছে একটি মহুয়াগাছের মাথায়। আজ রাতে সে একা আসেনি। কেননা, রহস্য উন্মোচনের প্রবল সম্ভাবনা আজ রাতেই। তাই দিঘিটার পাড়ের আড়ালে বসে আছেন দু কাকা ও তিন জেঠু। দিঘিটাকে টিকিবাবা ও বিশু দশ ভাগে ভাগ করে প্রতি রাতেই একভাগ তন্ন তন্ন করেছে। আজ বাকি শুধুমাত্র একটা ভাগ। হয় এই ভাগে গুপ্তধন মিলবে আজ রাতেই, না হয় মিশন শেষ হয়ে যাবে। রাম তাই আজ পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে।

মাঝ দিঘিতে একেবারে পানকৌড়ির মতো টুপটুপ ডুব দিচ্ছে বিশু ও শ্বেতবালক। ডুব দিয়ে কিছুক্ষণ থেকে ভেসে উঠছে ভুস করে, দিচ্ছে আবারো ডুব। টানছে লগি-আঁচড়া। এভাবে লগি-আঁচড়া টানে সেই ডুবুরিরা। পুকুর-দিঘি-ডোবার জলে ডুব দেয়, হারানো আংটি-চুড়ি-নাকফুল-কানের দুল-চেইন তুলে দেয়। বিনিময়ে কিছু টাকাপয়সা পায়।

এবারে প্রায় মিনিট খানেক জলের তলায় থেকে ভেসে উঠল শ্বেতবালক, হাতের লগি-আঁচড়া শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দে আধা চিৎকার দিয়ে বিশুর গালে একটা খুশির চাপড় মেরে বলল শ্বেতবালক, পেয়েছি! পেয়েছি! দে ডুব।

দুজনেই আবার জলের তলায় অদৃশ্য প্রায় এক মিনিট। এভাবে পরপর ৫/৭টি ডুব দিয়েই ওরা পাড়ের দিকে আসছে। একখানা কালো রঙের বাঁশ অথবা অন্য গাছ ভাসছে জলের উপরে। ওরা দুজনে ধরাধরি করে কিছু যেন টেনে আনছে জলের তলা দিয়ে। মোহর ভর্তি সিন্দুক!

উত্তেজিত রাম। ওরা দুজনে জল থেকে উঠে এল বড়ো একটা কলসি নিয়ে। ভারী কলসি। দুজনে ঠেলে ঠেলে ঢালু পাড় বেয়ে কলস গড়িয়ে দিয়ে দিয়ে উঁচু পাড়ে উঠতে চাইছে। পারছে না। মহুয়া গাছ থেকে দ্রুত নামতে শুরু করেই রাম দিল চিৎকার। কাকা-জেঠুরা দৌড়ে এসেই ধাওয়া দিয়ে ধরে ফেলল বিশু ও শ্বেতবালককে। কলস গড়িয়ে আবার জলে। জলকাদা মাখা পেতলের কলসিটা জল থেকে তুলে আনা হলো উঁচু পাড়ে।

দু-পাঁচ ঘা দিতেই গড়গড় করে সব রহস্য ও উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিল শ্বেতবালক। বিশু এখন পাথরের মূর্তি যেন। জানা গেল তেঁতুল গাছের ঈগলের বাসাটি ভাঙার পরে বিশু ওই বাসার তলার খোঁড়লে একটা অয়েল ক্লথ মোড়ানো পোটলা দেখে। তামার তার দিয়ে শক্তপোক্ত

করে পেঁচানো ছিল ওটা।
তখন ওটা তোলেনি বা খোলেনি। সে বুঝে ফেলেছিল, গোপন-মূল্যবান কিছু হবে ওটা। রাতে আবার গোপনে গাছে চড়ে নিতে হবে ওটা। বাড়ি নিয়ে খুলে পরখ করতে হবে। তো সেই রাতে গাছে চড়ে বাড়ি এনে খুলে দেখে একটি কারুকাজ খচিত রুপার পানের বাটা! বাবার সাহায্যে হাতুড়িপেটা করে বাটা বা ডিব্বাটা ভেঙে ভেতরে পায় একখানা হাতে লেখা চিঠি।

সেই চিঠির সরমর্ম হলো- ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে রামের ঠাকুরদার বাবা নৃপেন রায় পেতলের কলসিতে অয়েল ক্লথে মুড়ে ৩৮ সের ৯ আনা ৫ রতি সোনার অলংকার ভরে পেতলের ঝালাই করে মুখ আটকে দিঘিটার জলের তলার কাদাতে গেড়ে রেখে সপরিবারে খুলনার ডুমুরিয়া পেরিয়ে পশ্চিমবাংলায় চলে যেতে চেয়েছিলেন। কেননা, বাংলাদেশে তখন চলছে স্বাধীনতা যুদ্ধ। পাকহানাদাররা মারছে হিন্দুদের, জ্বালিয়ে দিচ্ছে বাড়িঘর। নৃপেন রায় সোনা ভরা কলসির কথা পরিবারের কাউকেই বলেননি, ভেবেছিলেন, দেশ স্বাধীন হলে ফিরবেন। কিন্তু ডুমুরিয়া থাকতেই পাকহানাদারদের গণহত্যার শিকার হন তিনি। খুলনা-বাগেরহাটের বহু হিন্দু পরিবার বর্ডার পার হয়ে পশ্চিমবাংলায় যাবার জন্য জড়ো হয়েছিল ডুমুরিয়ায়। সংবাদ পেয়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা ওখানে এসে চালিয়েছিল গণহত্যা। চিঠির সঙ্গে আলাদা কাগজে ফর্দ করে অলংকারগুলোর কোনটা কার, তারও একটা তালিকা তিনি রেখে দিয়েছিলেন রূপার পানের বাটার ভেতরে। পরম বিশ্বাসী নৃপেন রায়। এই তল্লাটের বহু হিন্দু পরিবার তাই ভারতে যাবার আগে তাদের গহনাপত্র গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল নৃপেন রায়ের কাছে। তিনি দেশের মাটি ছেড়ে কিছুতেই ভারতে যেতে চাননি, ভেবেছিলেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক যখন হলো না, তখন তিনিও স্থির করলেন যাবেন পশ্চিমবঙ্গে। যাবার আগে তিনি চিঠি ও ফর্দ করেন। প্রতিটা পরিবারের সোনার পরিমাণ ও গহনার নামসহ বিস্তারিত তথ্য লেখা আছে পানের বাটার ফর্দে।

পরিশেষে তিনি লিখেছেন: এই পানের বাটা যে জনই পাক না কেন, সে যেন তালিকা অনুযায়ী গহনাদি প্রাপকদের বুঝাইয়া দেন। প্রাপকগণ জীবিত না থাকিলে তাহাদের উত্তরাধিকারীরা প্রাপ্য হইবেন। না হলে কিন্তু নরকবাস ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না। বি: দ্র: কলসিটি দিঘির ভেতরে যেখানে গাড়িয়াছি, তাহার পাশেই একটি ১০ ফুট লম্বা সোনালু গাছ পুঁতিয়াছি। ইহাই চিহ্ন।

বিশুর আপন মাসতুতো ভাই হলো এই শ্বেতবালক। বাড়ি তার এখান থেকে অনেক দূরের এক গ্রামে, সিলেট জেলায়। বাটায় ভরা বিশাল ফর্দটা আর লম্বা চিঠিটা পেয়ে বিশুর বাবা ও মা মিলে বুদ্ধিটা দিয়েছিল বিশুকে। কেননা, দিন বা রাতে ওই দিঘিতে নেমে খোঁজাখুঁজিটা মোটেই সম্ভব ছিল না দাস বংশের কারো। বিশুর বাবার পক্ষে তো নয়ই। ভয়। কুসংস্কার। অন্ধবিশ্বাস। পূর্বপুরুষ সেই কেষ্ট দাসের জেল কষ্টের কথা, পীরের অভিশাপে সোনার মোহর পেতল হয়ে যাবার ঘটনা তো এই বংশের জন্য অভিশাপ। তাই, নৃপেন রায়ের সোনার গহনা ভরা কলসি তুলতে নেমে বিশুর বাবা নতুন করে কোনো অভিশাপের তলায় মাথা দিতে চায়নি। তারপরে এটা আবার খানজাহানের দিঘিতে লুকানো। তুলতে গেলে জীবনহানিও হতে পারে। কিন্তু সাহসী বিশু কোনো নিষেধ মানতে নারাজ। সে ওই কলস তুলবেই।

তবে, বিশু আবার এতটা সাহসী নয় যে রাতের বেলায় একা নামবে ওই পুকুরে। পীরের অভিশাপে বংশনাশও তো সে চায় না। একজন সঙ্গী পেলে সে নামতে পারবে। তখন মনে পড়ল ওর বাবার – এই শ্বেতবালকের কথা। সে বিশুর আপন মাসতুত ভাই। উদাস-বাউল স্বভাব।

মাথার পেছন দিকের মাথায় জটাচুল- সেই জটা বেঁধে জটাবল। সিলেট-চট্টগ্রামের মাজারে মাজারে ঘোরে। সময়-সুযোগ পেলে 'হারানো জিনিস খুঁজি'-দের দলে ভিড়ে গ্রামগঞ্জে ঘুরে ঘুরে হাঁক ছেড়ে বেড়ায়। দুর্দান্ত ডুবারু আর ডাইভারও।

বিশুর বাবা তখন জব্বর প্ল্যান আঁটে। প্ল্যানটা শুনেই রাম আনন্দে লাফ দেয়। আসুক শ্বেতবালক। পূর্বপুরুষ সেই কেষ্টদাসের ক্ষতিটা পুষিয়ে নেবেই নেবে। বদলে নেবে ভাগ্য। তখন বিশুর বাবা-মা তাকে মাসতুত ভাই শ্বেতবালককে এনে একটা জমজমাট নাটক সাজিয়ে কৌশলটা হাসিল করার বুদ্ধিটা দিয়েছিলেন। বিশুর বাবাই সিলেট গিয়ে শ্বেতবালককে সবকিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে করে গভীর রাতে নিয়ে এসেছিলেন এই গ্রামে।

শ্বেতবালক রাতটা কাটায় একটা গভীর বাগানে, লগি-আঁকশি বাগানে লুকিয়ে রেখে সকালে বাগান থেকে বেরিয়ে চলে যায় দিঘির পাড়ে। তারপরে সাজানো নাটকে অভিনয় করে। দারুণ একটা নাটক পরিবেশন করেছিল বটে। বালকের ছিল টিকি। কিন্তু বিশু, বিশুর মা-বাবা ছাড়া দাস বংশের অন্য কেউ এখন পর্যন্ত সত্যটা জানে না যে, এই টিকিবাবা কেষ্টদাসের সেই টিকিবাবা নয়। বংশের অন্যরা তো গুঁইসাপ বাবার বলা ভবিষ্যতের সেই টিকিবাবা ভেবে চারঘড়া মোহরের স্বপ্নে বিভোর আছে।

সব ঘটনা শুনে ও বুঝে রাম আবেগে জড়িয়ে ধরে বিশুকে। বিশু কাঁদতে কাঁদতে শ্বেতবালকের কথাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে বলে দেয়- সেই পূর্ব পুরুষের কথা- কেষ্টদাস, যিনি একঘড়া মোহর পেয়েও হারিয়ে ফেলেছিলেন, দুঘড়া মোহর পীরের অভিশাপে পিতল হয়ে গিয়েছিল। খেটেছিলেন জেল। সব শুনে রাম আর তার কাকা-জেঠুরা অবাক হলেন। কারণ, সেই ঘটনা বিশু ও বিশুর মা-বাবা ছাড়া এতদিন পর্যন্ত আর জানত না কেউ।

সবাই বুঝল, বিশুর বুকের ক্ষতটা কত গভীর, কতটা বেদনাদায়ক। একঘড়া সোনার মোহর! মোট ৩০০ ভরি সোনা! কলস ভরা এই সোনার গহনা বেচে ওরা জীবনটাকে বদলে নিতে চেয়েছিল। সেই এক পূর্ব পুরুষের এক ঘড়া খাঁটি মোহরের ক্ষতিপূরণ করতে চেয়েছিল।

বিশু আর শ্বেতবালককে নিয়ে রামরা রওয়ানা দিল বাড়ির দিকে। পানের বাটা, বাটার ভেতরের চিঠি ও ফর্দ যত তাড়াতাড়ি পড়া যাবে, ততই মঙ্গল।

বাতাস বইছে। রাম-বিশু আর টিকিবালক হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। রামের অশোক কাকার মাথায় কলসটা। কলসটা থেকে যেন ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

অশোক কাকার নাকে আসছে গোলা-বারুদ-বোমা ও মৃত্যুর গন্ধ। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিনি দেশেই ছিলেন। হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন বিপুল বিক্রমে। ৪৬ বছর বাদেও গন্ধটা তাজা তাজা লাগছে। চোখে ভাসছে ১৯৭১ সালের দুঃখিনী বাংলাদেশ। ভাবছেন, ১৯৭১ সালে হিন্দু পরিবারগুলো সীমান্ত পাড়ি দেবার আগে মাটি বা পিতলের ঘটি-কলসিতে পুরে গহনাদি মাটির তলায় পুঁতে রেখে গিয়েছিলেন। সারা বাংলাদেশের মাঠ-বাগানে এরকম কত গহনা যে মাটিচাপা পড়ে আছে! সবাইতো আর জীবন নিয়ে ফিরতে পারেনি স্বাধীন বাংলাদেশে।


# নবারুণ-এর গ্রাহক কুপন

**এই অংশটুকু কেটে ডাকে পাঠাতে হবে অপর পৃষ্ঠার ঠিকানায়**

গ্রাহকের নাম .....

ঠিকানা .....

| ৬ মাস | ১২ মাস | প্রতি কপির মূল্য | মোট মূল্য |
|---|---|---|---|
| | | ২০/- | |

গ্রাহকের স্বাক্ষর

নতুন পড়ুয়াদের জন্য খুব সহজ গপ্‌প

# আর নেব না আড়ি

## রেবেকা ইসলাম

মিতুদের সরকারি কলোনিতে অনেক মানুষ। তাই ওর খেলার সাথিও অনেক। লুনা, দিপু, ঝুমা, সুমি, নাবিল ...। ওদের সাথে রোজ বিকেলে খেলে মিতু। আর দুদিন পর মিতুর জন্মদিন। মা বলেছে এবার ছোটো করে আয়োজন হবে। শুধু কলোনির কিছু ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দাওয়াত করা হলো। প্রতি বছর তো বড়ো করেই হয়।

সেদিন বিকেলে মিতু সবার সাথে খেলায় মেতে উঠল। সবাই মিলে লুকোচুরি খেলল। তারপর হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে গান গাইল। রিংগা রিংগা রোজ !

হঠাৎ মিতু পড়ে গেল। ও হাঁটুতে ব্যথা পেল। ভীষণ রেগে গেল মিতু। মুখ বাঁকিয়ে বলল, তোমাদের সবার সাথে আড়ি! মিতুটা কথায় কথায় আড়ি নেয় লুনা বলে উঠল। মা বলেছে, আড়ি নেওয়া ভালো নয় সুমি ফিসফিসিয়ে বলল। দিপুটা বলল, আমি কখনই আড়ি নেই না।

মিতু আরো রেগে গিয়ে বলল, ঠিক আছে,আমি এমনই। তোমাদের সাথে জনমের আড়ি। কখনো আর কথা বলব না। এই বলে মাঝের আঙুলটা দেখিয়ে ও চলে গেল।

পরদিন তুমুল বৃষ্টি। কেউ খেলতে গেল না। বাসায় সবার বিকেল কাটল। মিতুও বিকেলটা টিভি দেখেই কাটাল।

তার পরদিন সোনালি রোদ উঠল। আজ মিতুর জন্মদিন।

মিতুদের বাসায় অনেক মজার মজার খাবার রান্না হয়েছে। বাবা বড়ো একটা কেক এনেছে। ওখানে লেখা শুভ জন্মদিন মিতুমণি।

বিকেলে মিতু গোলাপি রঙের একটা জামা পরে বসে আছে। তবে এখনো তো কেউ এল না। লুনা, দিপু, ঝুমা ...ওদের কী হয়েছে ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল,ও তো সবার সাথে জনমের আড়ি নিয়েছে। দৌড়ে জানালার কাছে গেল। দেখল সবাই খেলছে।

মা, আমি আর কখনো কারো সাথে আড়ি নেব না, কখনো না। আর নেব না আড়ি। বলেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল মিতু।


## ঠিকানা

বিক্রয় ও বিতরণ শাখা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।

ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

# তোমার জন্য বাংলাদেশের সংবিধান

**নূহু আব্দুল্লাহ্**

সুপারম্যানদের মধ্যে অন্যরকম একটি সুপারম্যান আছে। তার নাম হ্যানকক।

আর সব সুপারম্যানের মতোই সে আকাশে উড়তে পারে, ভারি ভারি জিনিস বয়ে নিয়ে যেতে পারে। অন্যসব সুপারম্যানের মতো মানুষের উপকারও করে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে তার!

হ্যানককের মানসিক শক্তি কম। সে তার বৌকে হারিয়ে ফেলেছে। তাই মনের কষ্টে থাকে। কোনো কাজ মনোযোগ দিয়ে করতে পারে না। ভালো কাজ করতে গেলেও সেটি খারাপ হয়ে যায়!

তার দুটি কাজের উদাহরণ দিই।

এক. দূরে এক বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। সেখানে একটি ছোট্ট শিশু আটকা পড়েছে। হ্যানকক খবর পেল। সে ওই শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য উড়াল দিল। যাওয়ার সময় তার সামনে তিন-চারটি বিল্ডিং পড়ল। সেই বিল্ডিংগুলোর মধ্য দিয়ে উড়ে গেল হ্যানকক। বিল্ডিংগুলো ভেঙে গেল!

দুই. একটি তিমি জোয়ারের সময় সাগরের একটি দ্বীপে আটকা পড়েছে। তিমি তো অনেক বড়ো প্রাণী। সেটিকে পানিতে নামাতে হলে কয়েকটি ক্রেন লাগবে। কিন্তু ওই জায়গায় ক্রেন যাওয়া অসম্ভব! এ অবস্থায় তিমিটিকে বাঁচাতে পারে একমাত্র সুপারম্যান, হ্যানকক।

হ্যানককের কাছে খবর চলে গেল। সে একটা উড়াল দিয়ে চলে গেল তিমিটির কাছে। তিমিটার লেজ ধরে তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলল সাগরে। খুব ভালো! হাততালি!!

কিন্তু সমস্যা হলো– একটি বড়ো জাহাজ ভেসে যাচ্ছিল সাগর দিয়ে। তিমিটা গিয়ে পড়বি তো পড় জাহাজের ওপর! জাহাজটা ভেঙেচুরে ডুবে গেল!

এরকম এক সুপারম্যান হ্যানকক। তার যন্ত্রণায় মানুষ অতিষ্ঠ। মানুষের জীবন, সম্পদ হুমকির মুখে! এ অবস্থায় মানুষ দলবেধে মিছিল বের করল, 'হ্যানকক, তোমার উপকারের দরকার নেই আমাদের। তুমি চুপ করে বসে থাকো। খাওদাও, আরাম করো, আমরা টাকা দেবো। তবুও তোমার উপকার চাই না!'

বেচারা হ্যানকক!

মানুষের আন্দোলনের দাবিতে পুলিশ হ্যানককে গ্রেফতার করল। জেলে আটকালো। হ্যানকক জেলখানার বিছানায় শুয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর তার আর ভালো লাগল না সেখানে। সে হ্যান্ডকাফ পরা হাত দুটো আস্তে করে টান দিতেই হ্যান্ডকাফ ভেঙে গেল। তারপর সে জেলখানার ছাদ ভেঙে বাইরে এসে বাসায় চলে গেল।

বাসায় যাওয়ার পর টিভি ছাড়ল হ্যানকক। দেখল, প্রেসিডেন্টের ভাষণ চলছে। প্রেসিডেন্ট হ্যানককে বলছেন, 'হ্যানকক, তুমি যত শক্তিশালীই হও, এ দেশের সংবিধানের চাইতে তুমি শক্তিশালী নও। আর সংবিধান অনুযায়ী তুমি মানুষের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে গেছো। কাজেই সংবিধান লঙ্ঘনের দায়ে তোমাকে গ্রেফতার করার আগে তুমি সারেন্ডার করো।'

হ্যানকক আর যাই হোক, ভালো মনের মানুষ ছিল। সে তার ভুল বুঝতে পারল। সে সারেন্ডার করল।

বলছিলাম সংবিধানের কথা। হ্যাঁ, সংবিধান আসলে সেই জিনিস, যা সুপারম্যানের চেয়েও শক্তিশালী!

কথাটি কেবল কথার কথা নয়, কথাটি সত্য। কারণ, একটি দেশে সংবিধান তৈরি করা হয় সে দেশের মানুষের জন্য। আর দেশ কীভাবে চললে সে দেশের লাখো-কোটি মানুষ ভালো থাকবে, তা বলা হয় সংবিধানে। দেশের মানুষের জন্য কি কি ভালো তা লেখা থাকে সংবিধানে। তাই সংবিধান জানা সবার প্রয়োজন। কারণ, সংবিধান না জানলে সেই ভালো কাজগুলো সম্পর্কে মানুষ জানতে পারবে না। আর না জানলে ভালো কাজগুলো করতে পারবে না। ফলে দেশের মঙ্গল হবে না। মানুষের মঙ্গল হবে না। দেশ পিছিয়ে পড়বে। মানুষ ভালো থাকবে না।

ধরা যাক, এইমাত্র আমাদের দেশটি স্বাধীন হলো। আমরা একটি ভূখণ্ড পেলাম, এখানে কিছু মানুষ তো আছেই। আমরা এখন স্বাধীন সবাই। এবার স্বাধীন হয়ে সবাই যদি ভাবতে থাকে, 'আমি এখন যা খুশি করতে পারি। যা ইচ্ছা তা চাইতে পারি, নিতে পারি!'

তখন কি অবস্থা হবে? বলাবাহুল্য, চরম অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা শুরু হবে!

যে কারণে একটি দেশকে সুন্দরভাবে চলতে হলে, দেশটির উন্নয়ন করতে হলে, দেশটির মানুষকে সুখে-শান্তিতে থাকতে হলে একটি নীতিমালা প্রয়োজন হয়। যার নাম সংবিধান।

বাংলাদেশের সংবিধান বলছে, 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'!

আমরা খুব ভাগ্যবান যে, আমাদের দেশের একটি চমৎকার সংবিধান আছে। কিন্তু পাশাপাশি আমরা দুর্ভাগ্যবান এ কারণে যে, আমরা আমাদের সংবিধানটি পড়ি না! আমাদের সংবিধান সম্পর্কে আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষের তেমন ধারণা নেই!

আর বলাবাহুল্য, সংবিধান না জানলে মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে জানবে না। তাকে কেউ ঠকালেও সে কিছু করতে পারবে না!

সংবিধান না জানা ব্যাপারটিকে যদি খাবারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হয়।

ধরা যাক, পৃথিবীর প্রথম মানুষ হিসেবে আমাদের একটি নতুন দ্বীপে ছেড়ে দেওয়া হলো। আমরা সেখানে যাওয়ার পর দেখলাম–নারকেল গাছ আছে, সাগরের পানি আছে, সাপ আছে, বুনো ছাগল আছে। আমরা যেহেতু কিছুই জানি না (যেমন সংবিধান সম্পর্কে জানি না, তেমন আর কি) তাই শুকনো নারকেল মাথার ওপর পড়বে বলে আমরা নারকেল গাছের ধারে কাছেও গেলাম না!

সংবিধান না জানলে জনগণ তার শক্তিকে জানতে পারবে না, কাজে লাগাতে পারবে না! ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, একজনের হাতে টর্চলাইট আছে। কিন্তু সে সেটি চালাতে জানে না। কাজেই অন্ধকারে পথ চলতে টর্চলাইটটি তার কোনো কাজে আসবে না।

সাগরের পানি নোনতা, কি উপায়ে সেটিকে খাওয়া হয় তা জানি না বলে পানি খেতে পারলাম না! ছাগলের জোরে দৌড়ানো দেখে আমরা ভয়ে পালিয়ে গেলাম! আর চিকন সাপ দেখে কোলে তুলে নিলাম গলায় মালা বানানোর জিনিস মনে করে! তাহলে কি হবে?

আমরা একদিকে না খেয়ে কষ্ট পাবো আর সাপ কামড় দিয়ে আমাদের পটল তুলতে (মরে যেতে) বাধ্য করবে! না জানলে যা হয় আর কি! সংবিধান না জানলে একটি দেশের মানুষের ভাগ্যে এমনটিই ঘটার কথা! ঘটেও তাই। এজন্য সবার সংবিধান জানা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনের কথা সংবিধান রচিত হওয়ার পরই শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ১৯৭৪ সালে শিক্ষা কমিশনের প্রধান ছিলেন। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে তিনি যে প্রস্তাবনা সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন তাতে তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন 'সংবিধানকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হোক' এই বলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন বাংলাদেশের সরকার প্রধান। বঙ্গবন্ধু সে প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তার এক বছরের মাথায়

আমরা বঙ্গবন্ধুকে চিরতরে হারাই! সংবিধানও আর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয় না!

কিন্তু আমরা তো সংবিধানের গুরুত্ব বুঝি। যারা বুঝি তাদের উচিত সংবিধানকে আপন করে নেওয়া। নিজেদের ভালো, দেশের ভালোর জন্য আমাদের সংবিধান জানা খুব প্রয়োজন। সংবিধান কোনো ধর্ম, জাতি, গোষ্ঠীর মানুষের জন্য নয়, সংবিধান সবার। সংবিধান বিজ্ঞান, মানবিক বা কলা বিভাগের শিক্ষার্থীর জন্য নয়, সংবিধান সবার। কারণ, সবাই রাষ্ট্রের 'জনগণ'। আর বাংলাদেশের সংবিধান বলছে, 'রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'!

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে প্রতিটি মানুষ, সে যত বড়ো মানুষই হোক না কেন, সংবিধান সকলকে সমান মর্যাদা দিয়েছে।

**আমরা একদিকে না খেয়ে কষ্ট পাব আর সাপ কামড় দিয়ে আমাদের পটল তুলতে (মরে যেতে) বাধ্য করবে! না জানলে যা হয় আর কি! সংবিধান না জানলে একটি দেশের মানুষের ভাগ্যে এমনটিই ঘটার কথা! ঘটেও তাই। এজন্য সবার সংবিধান জানা প্রয়োজন।**

সকলে সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য! সংবিধান এমনই শক্তিশালী। এটি আমাদের সর্বোচ্চ আইন। আর সংবিধানের শক্তির উৎস জনগণ। তাই সংবিধান না জানলে জনগণ তার শক্তিকে জানতে পারবে না, কাজে লাগাতে পারবে না। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, একজনের হাতে টর্চলাইট আছে। কিন্তু সে সেটি চালাতে জানে না। কাজেই অন্ধকারে পথ চলতে টর্চলাইটটি তার কোনো কাজে আসবে না।

সংবিধান একটি আলো। সত্যের আলো, ন্যায়ের আলো, শুভশক্তি, মঙ্গলের আলো। যে আলো সবখানে জ্বলে উঠলে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে সকল আঁধার কেটে যাবে। এ আলো হাতে হাতে চলে যাক। দেশের প্রতিটি মানুষ সংবিধান জানুক। যারা জানেন, তারা অন্যকে জানাতে কাজ করুক। চারিদিকে সংবিধানের আলো জ্বলে উঠুক। সকলের মঙ্গল হোক, দেশের মঙ্গল হোক- সবশেষে এই শুভ কামনা।

## বাংলাদেশের সংবিধান সম্বন্ধে অজানা তথ্য

- সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিল ৩৪ জন
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বেগম
- বাংলা ও ইংরেজি সংবিধানের ২টি পাঠ
- সংবিধান শুরু হয় প্রস্তাবনা দিয়ে এবং শেষ হয় ৪টি তফসিল দিয়ে
- বাংলাদেশের সংবিধানে ১১টি ভাগ এবং ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ/ধারা রয়েছে
- প্রথম হাতে লেখা সংবিধানের মূল লেখক হলেন আবদুর রউফ
- এটি ছাপাতে ব্যয় হয়েছিল ১৪ হাজার টাকা
- অলংকরণের দায়িত্বে ছিলেন শিল্পী হাশেম খান
- হস্তলিখিত সংবিধানের অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
- সংবিধান গণপরিষদে বিল আকারে উত্থাপিত হয় ১২ই অক্টোবর, ১৯৭২ সালে
- সংবিধান পাস এবং আইনে পরিণত হয় ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ সালে
- জাতীয় সংসদে প্রণীত হয় ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ সালে
- জাতীয় সংসদে কার্যকর হয় ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে
- মূল সংবিধানের কপিটি বর্তমানে সংরক্ষিত আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে
- বাংলাদেশ সংবিধান মোট ১৬ বার সংশোধিত হয়েছে, সর্বশেষ সংশোধনী হয় ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে
- সংবিধানের ২৭ ধারায় বলা হয়েছে 'আইনের চোখে সব নাগরিক সমান'।

# স্বপ্নবানের দেশে

ম্যারিনা নাসরীন

টিফিনে আজ নুডুলস দিয়েছিল। মিশু খায়নি। এই বস্তু ওর চক্ষুশূল। তবুও কেন যে মা দেয়!

জব্বর খিদে পেয়েছে। ঘরে এসে দ্রুত স্কুল ড্রেস ছেড়ে মিশু ডাইনিং টেবিলে দৌড়ায়। প্লেটে আলু, ডিমের ঝোল, লালশাক, ডাল। এক পাশে এক টুকরো লেবুও আছে।

ঘরে কেউ নেই। মা-বাবা দুজনেই অফিসে। শুক্র আর শনিবার ছাড়া বাকি দিনগুলোতে মিশুকে দুপুরে একাই খেতে হয়। গত এক বছর ধরে এমন চলছে। জমিলা চাচি ঘরের অন্য সব কাজ গুছিয়ে মিশুর জন্য প্লেটে খাবার রেডি রেখে যায়। ডিম দেখে চোখ ঝলমল করে ওঠে মিশুর। কিন্তু হঠাৎ মনে হলো অন্য রকম কিছু একটা ঘটছে। বাইরে শোঁ শোঁ আওয়াজ। ঘরের মধ্যেও আলো অনেক কম। মিশু জানালার কাছে ছুটে যায়। ওরেব্বাস! চারপাশে একদম নিকষ কালো অন্ধকার। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পুরো আকাশ জুড়ে সোনালি রঙের বিশাল বিশাল লাঙলের ফলা এপাশ থেকে ওপাশ ছুটে বেড়াচ্ছে। গুড়ুমগুড়ুম হুড়ুম আওয়াজে দৈত্যের হুংকার।

সব ঘরের জানালা খোলা। মিশু বাইরে থেকে পাল্লা টেনে জানালা বন্ধ করতে গিয়ে পারে না। মনে হলো কেউ দু-হাতে ওপাশ থেকে টেনে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। রান্নাঘরের তাক থেকে হাঁড়ি পাতিল হুড়ুম দাড়াম করে পড়ছে। মায়ের শোবার ঘরের জানালার কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল। ওয়ালমেটের একটাও দেয়ালে নেই। শুধু ক্যালেন্ডারটা ঘুরে ঘুরে বাড়ি খায়। মিশুর মনে হলো অনেকগুলো দৈত্য মিলে পৃথিবীটাকে ধরে ঝাঁকি দিচ্ছে। এখনই হয়ত দালান কোঠা সব ভেঙে পড়বে। ওর খুব ভয় করতে লাগল। মায়ের ঘরে খাটের একপাশে ও গুটিসুটি হয়ে বসে থাকে।

ঝড়টি কয়েক মিনিট মাত্র স্থায়ী ছিল। তারপরই চারপাশ সুনসান। ভাঙা কাচের জানালা দিয়ে হু হু করে ভেজা হাওয়া ঢুকছে। দেয়ালের গায়ে ক্যালেন্ডারটা নড়ে আর থ্যাপ থ্যাপ শব্দ করে। সেই শব্দে মিশুর বুক হিম হয়ে আসে।

দিস ইজ হোয়্যার মাই ড্রিমস হাইড...বেশ কিছুক্ষণ থেকে গানটির দু'লাইন বারবার বাজছে। মিশু শুনছে কিন্তু ও ভুলে গিয়েছিল এটা ওর মোবাইলের রিং টোন। মিশু নিজে সেট করেছিল। নিশ্চয়ই মা ফোন করেছে। কি অদ্ভুত! মা-বাবা কাউকে ফোন করার কথা একবারও মনে হয়নি। দ্রুত ফোন ধরে মিশু।

ফোন ধরছ না কেন বাবা? তুমি ঠিক আছ তো? মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠে মিশুর চোখ ভিজে আসে। ধীরে ধীরে বলে, মা তাড়াতাড়ি এসো।

ভয় পেও না বাবা, আমি বেরিয়ে পড়েছি।

কিছুক্ষণ পর বাবার ফোন, বাবা ভয় পাওনি তো? মিশু বলে, না বাবা ভয় পাইনি।

কিন্তু আসলে এখনো ভয়ে ওর মুখটা এতটুকুন হয়ে আছে। বুকের মধ্যে দ্রিম দ্রিম হাতুড়ি পড়ছে।

সবকিছু শান্ত হয়ে এলে পেটের ক্ষুধা আবার চাঙা হয়ে ওঠে। ডাইনিং রুমে গিয়ে হতাশ হয় মিশু। ভাতের প্লেট আলগা। ধুলাবালিতে ভাত-তরকারি মাখামাখি। দুইটা গ্যালাক্সি চকলেট খেতে খেতে মিশু ভাবে, মা চাকরি না করলে ভালো ছিল। সবসময় মা মিশুর সাথে থাকতে পারত। অবশ্য মায়ের চাকরি ওর খুব ভালো লাগে। মায়ের অফিসে অনেকবার গিয়েছে মিশু। মা যখন চোখে চশমা পরে ফাইলে কাজ করে তখন মাকে খুব অন্যরকম মনে হয়। মিশু কম্পিউটারে খেলতে খেলতে মাকে দেখে। কী সুন্দর যে লাগে!

কিছুই ভালো লাগছে না। কখন যে মা আসবে! মোবাইলে খেলতেও ইচ্ছে করছে না। ড্রয়িং রুমে বাতাস বেশি ঢোকেনি। সেখানে সোফায় শুয়ে মিশু মায়ের অপেক্ষা করে। ঠিক সেই সময় অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটল। ছেলেটি ওর বয়সি। এগারো-বারো বছর হবে। হালকা পাতলা গড়ন। গায়ে একটা সবুজ রঙের টি-শার্ট। চুলগুলো সামান্য খাড়া। মুখে স্মিত হাসি । সব থেকে আশ্চর্য ওর চোখ দুটো। সেই চোখে কী যেন অচেনা জ্বলজ্বলে একটা আলো আছে। এক দেখাতেই আপন লাগে। খুব কাছের মনে হয়। সোফার পাশে একটা চেয়ারে বসে আছে ছেলেটি। মিশুর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কিন্তু ও কীভাবে ঘরের মধ্যে এল?

ঝড় দেখে তোমার খুব ভয় লেগেছে মিশু? ছেলেটি মনে হলো অনেক দূর থেকে কথা বলছে। মিশু ওকে চেনে না, কিন্তু মিশুকে কীভাবে চিনল?

হুম, একা ছিলাম তো।

ওমা একা থাকলেই বুঝি ভয় পেতে হবে? আমি তো ভয় পাই না।
তুমি কে? এখানে কীভাবে এলে?

আমি কে সেটা পরে বলব। তবে আমি সবখানে যেতে পারি।

সত্যি? তুমি আকাশে যেতে পারো?

হুঁ, পারি।

মঙ্গলগ্রহে?

হুঁ সেটাও পারি।

অ্যান্টার্কটিকা যেতে পারবে?

হুম পারব । যাবে তুমি?

নাহ, ওখানে তো বরফ; আমি একদিনেই ঠান্ডায় মরে যাব। আচ্ছা তুমি কোথায় থাকো?

আমার একটা দেশ আছে। যেখানে আমি থাকি। অদ্ভুত সুন্দর দেশ। ঝগড়া-মারামারি কিচ্ছু নেই। নীল আকাশ, নদী আর সবুজে ঘেরা।

তোমার দেশে গ্রাম আছে?

হ্যাঁ, ছবির মতো সুন্দর গ্রাম আছে। নদী, সাগর, পাহাড়, বন সব আছে। তুমি দেখতে যাবে?

আমাকে নিয়ে যাবে তোমার দেশে?

আমি তোমাকে অবশ্যই নিয়ে যাব। আমার পুরো দেশ তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাবো। তুমি তোমার ল্যাপটপ ওপেন কর।

কেন, ল্যাপটপ কেন?

**গেম ওপেন করে ওরা একে অপরের অ্যাটাকে যায় না বরং সন্ধি করে। মিশুর মনে হলো আচমকা ওরা অন্য একটি জগতে চলে এসেছে। চারপাশে সবুজের কী সমারোহ! এমন সবুজ কোনো দেশে হয়?**

একটা সফ্টওয়্যার ডাউনলোড করতে হবে তবেই আমি তোমাকে সে দেশে নিয়ে যেতে পারব।

মিশু টেবিল থেকে ল্যাপটপ নামিয়ে অন করে। ভাগ্য ভালো রাতে চার্জ দিয়ে রেখেছিল। ছেলেটি দ্রুত হাতে ল্যাপটপে কাজ করছে । মিশু কম্পিউটারের অনেক অ্যাপসের বিষয় জানে। প্রোগ্রামিং শিখেছে কিছুটা। কিন্তু ওকে ফলো করতে পারছে না। তবে এটা কোনো মাইন্ড গেমের সফটওয়্যার হবে। এ ধরনের আরো অনেক মাইন্ড ক্রাফট গেমস-এর সফ্টওয়্যার মিশু ডাউনলোড করে রেখেছে। এটা হয়ত তার কোনো অত্যাধুনিক ভার্সন।

ছেলেটি জয়েস্টিক সংযোগ দিয়ে একটি নিজে নেয় অন্যটি মিশুর হাতে দিয়ে বলে, দেখো আমরা এখন এই জয়েস্টিক দিয়ে খেলব। কিন্তু আজ আমরা কেউ

কাউকে অ্যাটাক করব না। দুজনে শুধু হাত ধরে নতুন একটি দেশ ঘুরব।

মিশু খুব অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে তাকায়, এই মুহূর্তে তাকে বড়োদের মতো লাগছে । ঠিক যেন বাবা।

গেম ওপেন করে ওরা একে অপরের অ্যাটাকে যায় না বরং সন্ধি করে। মিশুর মনে হলো আচমকা ওরা অন্য একটি জগতে চলে এসেছে। চারপাশে সবুজের কী সমারোহ! এমন সবুজ কোনো দেশ হয়? ওরা এই মুহূর্তে যে জায়গায় এসেছে সেটা বিশাল একটি বন। যেদিকে চোখ যায় গাছ আর গাছ। ছেলেটি ওর হাত ধরে সেই বন পার হতে থাকে। আর জোরে জোরে বলতে থাকে, মিশু নীচে তাকিয়ে দেখো। মিশু তাকিয়ে হতবাক হয়ে যায়। বিশাল ডোরাকাটা বাঘ, ওদের পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে হরিণ। গাছে বানরেরা একজন আরেকজনের গা চুলকিয়ে দিচ্ছে। মিশু ফিক করে হেসে দেয়। আরো কিছুদুর যেতেই দেখতে পায় ইয়া লম্বা লম্বা অজগর। মিশু ভয়ে ছেলেটির হাত জোরে চেপে ধরে। ছেলেটি হাসে, ভয় নেই ওরা আমাদের বন্ধু, কামড়াবে না। এ জঙ্গলে সব পশু বন্ধুর মতো থাকে। দেখো ওই যে কত বড়ো বড়ো হাতি। ঘোড়াগুলো কেশর ফুলিয়ে দৌড়াচ্ছে।

বনের পথ শেষ হয়ে এসেছে,ওরা এখন একটা মাঠের কাছে। মাঠ জুড়ে সোনালি রং চিকচিক করছে। মিশু জানতে চায় এগুলো কী? ছেলেটি বলে, এগুলো ধান। মিশু আগে কখনো ধানের গাছ দেখেনি । ওরা ক্ষেতের আরো অনেক কাছে চলে যায়। সবুজ ঘাসের মতো ছোটো ছোটো গাছে সোনালি ধান। মিশু হাত দিয়ে কয়েকটা ধান তুলে নেয়। উফ! কী সুন্দর ঘ্রাণ।

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে ওরা আসে গাছপালায় ঘেরা একটি গ্রামে। ছোটো ছোটো মাটির ঘরগুলো রুপালি রঙের। উপরে সোনালি ছনের ছাউনি। ঘরের সাথে সবুজ মাঠে অনেকগুলো শিশু খেলছে। প্রত্যেকটা ঘরের পাশে একটি করে পুকুর। টলটলে পানির নীচে মাছকে সাঁতরে বেড়াতে দেখে মিশু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। গ্রাম বেড় দিয়ে একটা নদী আঁকাবাঁকা হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে দিগন্তে মিশে গিয়েছে। নদীর বুকে হরেক রঙের পাল তোলা নৌকা। ছবিতে এমন অনেক গ্রাম এঁকেছে মিশু কিন্তু বাস্তবে কখনো গ্রাম দেখেনি, আজ দেখে অভিভূত হয়ে গেল।

গ্রামের রাস্তা শেষ হবার পরেই ওরা আর একটি বিশেষ এলাকায় চলে আসে। সেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে নানা ধরনের মেশিন। উঁচু উঁচু চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। মেশিনে কাজ চলছে। মিশু ছেলেটার দিকে তাকায়। ছেলেটি বুঝে ফেলে। বলে, এটা শিল্প এলাকা। গ্রাম আর শহরের মাঝের একটা জায়গায় করা হয়েছে যাতে দূষণ না ঘটে।

শিল্প এলাকা পার হয়ে ওরা ঝকঝকে আর একটি শহরে চলে এল। ছেলেটি মিশুর হাতে একটু চাপ দিয়ে বলে, ওই দেখ কী! জায়গাটা অনেক বড়ো বড়ো খেলনা দিয়ে সাজানো। অনেকটা নিচে নেমে আসে ওরা। উঁচু দিয়ে কয়েকটা চরকা ঘুরছে। ঝিকঝিক শব্দ করে ট্রেন চলছে। ছোটো-বড়ো নানা বয়সের শিশুরা ছুটাছুটি করে খেলছে। হইহল্লা করছে। ওয়াও! এ তো ডিজনি ল্যান্ড! মিশু চিৎকার করে। তুমি ডিজনি ল্যান্ডে গিয়েছ? ছেলেটি জানতে চায়।

খেয়াল করে দেখ মিশু, এটা ডিজনিল্যান্ড নয়। ডিজনি ল্যান্ডের মতো একটি শিশু পার্ক।

হোক না, এত্ত সুন্দর জায়গায় তুমি থাকো দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

চলো তোমাকে আরো কিছু দেখাই।

দুজন বেশ খানিকটা সময় উড়ে কোথায় যে চলে এল! চারপাশে কোথাও লাল মাটি, কোথাও বা সবুজ বনে ছাওয়া পাহাড়। এমন তো সে আগে দেখেনি। মিশু তুমি কখনো পাহাড়ে উঠেছ?

নাহ। দেখিইনি। থ্যাংকস তুমি আমাকে পাহাড়ে নিয়ে এসেছ। দেখো রাস্তাগুলো কী সুন্দর। পাহাড়ের মধ্যদিয়ে সরু ফিতার মতো রাস্তা অনেক ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গিয়েছে। মাঝে মাঝে লাল-নীল রঙের টিনে ছাওয়া কী দারুণ সব বাড়ি। এক জায়গায় রিনঝিন শব্দ শুনে তাকায় ওরা। পাহাড়ি ঝরনার পানির শব্দ ছিল ওটা। মিশু জাফলং-এ এমন ঝরনা দেখেছিল। সেখানে ও গোসলও করেছিল। কিন্তু এই ঝরনাটি আরো বেশি সুন্দর।

মিশু মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে থাকে। এরপরের দৃশ্যে মিশুর চোখ আটকে যায়। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু পানি আর পানি। নীল পানির কোথাও কোথাও সূর্যের আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। পানির ধার ঘেঁষে বালুচর। অসংখ্য মানুষ সেখানে হাঁটছে, পানি নিয়ে

খেলছে। অনেক শিশু আছে তাদের সাথে। মিশুর মনে হলো এই জায়গায় সে আগেও এসেছে। বাবা-মায়ের সাথে পানিতে নেমেছে। কিন্তু সেই জায়গা এতটা ঝকঝকে পরিষ্কার আর সুন্দর ছিল না। বিশাল সেই আনন্দমেলা পার হয়ে ওরা অনেকক্ষণ ধরে উড়তে থাকে। নীচে চলন্ত ছবির মতো পার হয়ে যায় মাঠ, নদী, প্রান্তর আর ঝকঝকে শহর।

বেশ খানিক সময় ধরে ছেলেটি কথা বলছে না। তুমি কথা বলছ না কেন? মন খারাপ?
হ্যাঁ মিশু আমার মন খারাপ।
কেন?
পরে বলব। এখন চলো নিচে নামি।

খুব ছোটো নিরিবিলি শান্ত জায়গা। ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা বাঁধাই করা চত্বরে ঢোকে। সেখানে একটি সমাধিকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। সবার হাতে ফুল। সমাধিতেও অনেক ফুল। সমাধির গায়ে কিছু একটা লেখা রয়েছে। কিন্তু এত দূর থেকে মিশু সে লেখা পড়তে পারে না। মিশু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ছেলেটির চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। মিশু জানতে চায় এটি কার কবর? তুমি কেন কাঁদছ?

ভাঙা গলায় ছেলেটি বলে, এটি একজন স্বপ্নবান পুরুষের কবর। সেই পুরুষটির জন্য কাঁদছি।

ওরা যখন হাত ধরে উপরে উঠে এল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অনেক দূরের একটি জায়গায় হরেক রঙের আলোক পিণ্ড থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোকে অনুসরণ করে ওরা এগিয়ে যেতে থাকে। যত কাছে যাচ্ছে ততই উজ্জ্বল হচ্ছে আলোগুলো।

দেখতে দেখতে ওরা ঝলমলে একটা শহরে এসে হাজির হয়। পুরো শহর নানা রঙের লাইটে সজ্জিত। রাস্তাগুলো ঝকঝকে। রাস্তায় কোনো জ্যাম নেই। আর মানুষগুলো কত সুশৃঙ্খল। মিশু সারা শহরে কোনো ট্রাফিক পুলিশ দেখতে পেল না। এমনকি কোথাও টহল পুলিশ নেই। একটি টুকরো কাগজ পর্যন্ত রাস্তায় পড়ে নেই। একটি রাস্তার মোড়ে সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলছে সামনে পেছনে কোনো গাড়ি না থাকা সত্ত্বেও একটি গাড়ি বাতিটি সবুজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। রাস্তার দুপাশে বড়ো বড়ো

গাছে সবুজ পাতা ছেয়ে আছে। মোড়ে মোড়ে নানা ধরনের ভাস্কর্য। মিশু চোখ ফেরাতে পারে না।

মিশু চলো এবার তোমাকে আমার বাড়ি দেখাবো। অনেকক্ষণ পরে কথা বলে ছেলেটি।

এই জায়গাটা অতটা আলো ঝলমলে নয়। আলো ছায়ার মধ্যে দোতলা একটি বাড়ি। চারপাশের বড়ো বড়ো গাছের ফাঁক দিয়ে জোছনার আলো এসে বাড়িটিকে অনেকটা রহস্যময় করে তুলেছে। আধো আলো আধো ছায়ায় ছেলেটিকেও খুব অন্যমনস্ক লাগছে।

ওরা নিরবে বাড়িটির ভেতরে প্রবেশ করে। একটার পর একটা ঘর দেখে। প্রতিটা ঘরে নানা ধরনের ছবি দিয়ে সাজানো। ছবির মানুষগুলোর সাথে ছেলেটিও রয়েছে। কিন্তু মিশু ছেলেটিকে কিছু বলে না। বিশাল একটি ছবিতে একজন বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ পড়ে আছেন সিঁড়িতে । এই মানুষটিকে মিশুর খুব পরিচিত মনে হয়, কোথায় যেন দেখেছে। মিশু আর থাকতে পারে না । বলে, কাদের ছবি এগুলো?

ছেলেটি অনেক দূর থেকে যেন জবাব দেয়। আমার বাবা-মা-ভাই-ভাবি।

তাঁরা কোথায়? বাড়িতে দেখছি না তো।

তাঁরা কেউ নেই।

কী অদ্ভুত! এত বড়ো বাড়িতে গেটের দারোয়ান ছাড়া কোনো মানুষকে মিশু দেখতে পেল না। ওরা হাঁটতে হাঁটতে ছাদে চলে আসে। আকাশে বিশাল চাঁদ। চারপাশের গাছ আর চাঁদ মিলে মিশুর একটু একটু ভয় করতে থাকে। ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলে,

আসলে তুমি কে বলো তো?

ছেলেটি এবারো যেন অনেক দূর থেকে জবাব দিল, আমি রাসেল।

যে দেশটি তোমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এলাম সেটি ছিল আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের দেশ। কবরটি তাঁর। ১৫ আগস্টে আমার বাবা-মা-ভাইয়ের সাথে আমাকেও ওরা মেরে ফেলেছিল। আমি এখনো আমার বাবার এই স্বপ্নের দেশের সবখানে ঘুরে বেড়াই।

রাসেল চুপ করে থাকে। মিশুর বুকের ভেতর কাঁপছে। গত ১৫ আগস্টে জাতীয় শোক দিবসে মিশু স্কুলে বক্তৃতা দিয়েছিল। ও জাতির পিতার কথা পড়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কথা পড়েছে, ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা পড়েছে। শিশু রাসেল ওরই বয়সি ছিল। তাঁর কথা বলতে গিয়ে সেদিন স্টেজে মিশুর চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়েছিল। যারা স্টেজে বসেছিলেন তাদের সবার চোখ সজল ছিল।

আকাশের চাঁদটি অনেকটা হেলে পড়েছে। চাঁদের আলোও কমে এসেছে। মিশু রাসেলের আর একটু কাছে সরে এসে বলে, দেখে নিও আমরা নিশ্চয়ই একদিন স্বপ্নবান পুরুষের স্বপ্ন পূরণ করব। তাঁর তৈরি বাংলাদেশকে এমন সোনার দেশের মতো করে গড়ে তুলব।

রাসেল কিছু বলে না। শুধু আলোকময় দৃষ্টিতে মিশুর দিকে তাকিয়ে থাকে। মিশুর চোখ ভিজে আসে। ও হাত বাড়িয়ে রাসেলকে ছুঁতে যায় তখনই তীক্ষ্ণ কিছু শব্দ ভেসে আসে। কলিং বেল বাজছে। মনে হলো কেউ দরজা ভেঙে ফেলতে চাইছে।

মিশু, বাবা দরজা খোলো।

দরজা খোলো বাবা । আমি মা।

মা!!!


এখানে নবারুণ পাওয়া যায়

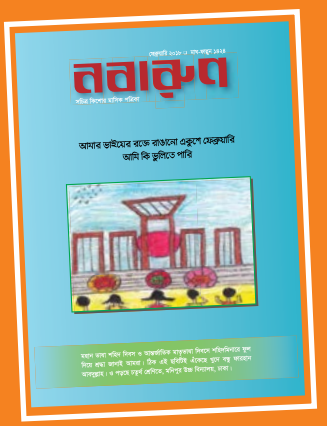


সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র
বায়তুল মোকাররম মার্কেট, ঢাকা
মোবাইল নং: মিলন ০১৭১০৮০৪৫৬৫

# দুই ভাই

**মিলন বনিক**

এভাবে বিদায় বলতে নেই।

রতন তলপেটের নিচে গামছাটা চেপে ধরে সান্ত্বনা দিল। বাদলকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। থেমে থেমে চোখ দুটো ঘোলা হয়ে আসছে। মাথার ওপর আকাশটা ঘুরছে। চোখের পাতা দুটো নাড়াতে পারছে না। শরীরে একটুও শক্তি নেই। নিশ্বাস নিতেও খুব কষ্ট হচ্ছে। বাদল রতনের হাত দুটো চেপে ধরেছে। মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। খুব কষ্টে একবার শুধু ঠোঁট নেড়ে বলল, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে রে রতন। শেষ বারের মতো একটু ঘুমাতে দে। আমার ভাইটাকে আর দেখা হলো না।

রতন চাচ্ছে না বাদল ঘুমিয়ে পড়ুক। নানান কথা বলে মনে সাহস জোগানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে আর কিছুই করার নেই। সবকিছুই ওপরওয়ালার হাতে। যা করার তিনিই করবেন।

জায়গাটা নির্জন। ঘন ঝোপঝাড়। কয়েকটা কড়ই, হিজল, তমাল গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বড়ো অশ্বত্থ গাছটা পুরো জঙ্গলটার ওপর ছায়ার মতো ছাতা মেলে ধরেছে। এত রাতে নদীর পাড়ে এমন ভূতুড়ে জায়গায় ওরা দুইজন মাত্র মানুষ। ভয়ডর নেই। রতনের কাঁধে রাইফেল। বাদলের রাইফেলটা কাত করে মাটিতে রেখে রতনের কোলে শুয়ে আছে বাদল। বাদল বাম হাতের পাশে রাখা রাইফেলটা ধরে রেখেছে।

রতনের হাতে টাটকা গরম রক্ত। রক্তের রং যে লাল, তা অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। কাঁধের গামছা, গেঞ্জি চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছে রক্ত বন্ধ করার জন্য। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। গুলিটা লেগেছে কোমরের নিচে ডান উরু বরাবর।

বাদলের কথা বন্ধ হলেই রতন আবার কথা বলে। চুপ থাকলে মনের ভয় বেড়ে যায়। তাড়াতাড়ি নাকে, মুখে, বুকে হাত দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেয়। আর কেবল আশ্বাস বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে, এই তো ভোর হয়ে এল। আর একটু সময় ধৈর্য ধর। পুব-আকাশটা ফর্সা হয়ে উঠলেই আমরা ক্যাম্পে চলে যাব। ওখানে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার রাতুদা আছেন ওখানে। খুব ভালো মানুষ।

বাদল চুপ। কোনো কথা বলছে না। তার কান পর্যন্ত কোনো শব্দ পৌঁছাচ্ছে না। রতন বার বার হাত দিয়ে দেখছে। বুকটা ধুক ধুক করছে। জান আছে। মনে হচ্ছে জ্ঞান হারিয়েছে। অনেকক্ষণ পর বাদলের জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলে জিজ্ঞাসা করল, আমি কোথায়? আমরা জঙ্গলে কেন? রাজীব, মনির, মিজান, টুন্টু ওরা কোথায়? ওরা ঠিকমতো ফিরতে পেরেছে তো?

ওরা ভালো আছে। অপারেশন শেষ করে ওরা ক্যাম্পে ফিরে যাবে। রতন বলল, জানোয়ারগুলো মরেছে তো?

হুম, মরেছে। একটাও বেঁচে নেই।

ওই জানোয়ারগুলোর কী হলো? নুর হোসেন, খবিরউদ্দিন। আমি সুস্থ হলে আগে ওদের খতম করব।

ওসব এখন ভাবতে হবে না। সান্ত্বনা দিল রতন। বাদলকে কথা বলতে দেখে রতন মনে সাহস ফিরে পেল।

ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়াটা বেশ ভালোই লাগছে। কিছুক্ষণ পর আবার নীরবতা। বাদলের মুখে কোনো শব্দ নেই। ঘুম না অচেতন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রতন একহাতে বাদলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অন্য হাতে যেখান থেকে রক্ত ঝরছে সেখানটা চেপে ধরে আছে। চুপসে চুপসে রক্ত ঝরছে। গামছা, লুঙ্গি, গেঞ্জি সব ভিজে চুপসে গেছে।

আশপাশে ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা চিঁ চিঁ শব্দ। অশ্বত্থ গাছের আড়াল থেকে একটা তক্ষক কিছু সময় পর পর ডেকে উঠছে। মাঝে মধ্যে কয়েকটা নিশাচর পাখির এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে যাওয়ার শব্দ। রতন মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকে বলছে, তাড়াতাড়ি যেন সকাল হয়। আমি যেন বাদলকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি। রাত এখন কত হবে? আনুমানিক তিনটা।

রতন হিসাব মিলিয়ে দেখছে। রাত বারোটার দিকে অপারেশন শুরু করেছিল নয়াপাড়া পাকিস্তানি ক্যাম্পে। ক্যাপ্টেন মনসুর ভাইয়ের 'ফায়ার' নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথে শুরু হলো প্রচণ্ড গোলাগুলি। বৃষ্টির মতো গুলির শব্দ। ক্যাম্পে আটকা পড়ে আছে বাদলের ছোটো ভাই ইমরান।

ওরা ইমরানকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বাদলের খোঁজখবর পাওয়ার জন্য। ইমরান কিছুই জানতনা। সে বন্ধুদের সাথে ডাংগুলি খেলছিল। এ পথ দিয়েই যাচ্ছিল নুর হোসেন আর খবিরউদ্দিন। ওদের আসতে দেখে ইমরান বন্ধুদের বলল, ঐ তো রাজাকার আসছে।

শয়তানগুলো ঠিকই ইমরানের কথা শুনে ফেলেছে। খবিরউদ্দিন ইমরানকে কাছে ডেকে বলল, তোর ভাই বাদল নাকি মুক্তিযোদ্ধা হইছে?

আমি জানি না।

কই আছে তোর ভাইজান?

জানি না।

ইমরানের সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে নুর হোসেনদের সাথে আরো তিনজন যোগ দিল। ইমরান ওদের চেনে না। এ গ্রামেও কখনো দেখেনি। এরমধ্যে ডাংগুলি খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুদের কয়েকজন আগাম বিপদ টের পেয়ে ছুটে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি খেয়াল করছে। রিপন একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বুঝে খবরটা দিতে যাচ্ছিল রতনদা'কে। তখনি নুর হোসেন বলল,

চল, আমি জানি তোর ভাই কোথায় আছে। তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।

এ কথা ইমরানের মোটেও বিশ্বাস হচ্ছে না। এটা নিশ্চয়ই ঐ শয়তাগুলোর ছলচাতুরি। অন্য কোনো কুমতলব আছে। ইমরান প্রতিবাদ করল, না, আমি যাব না। দরকার হলে ভাইয়া নিজে আসবে।

আসবে কোত্থেকে?

সে তো

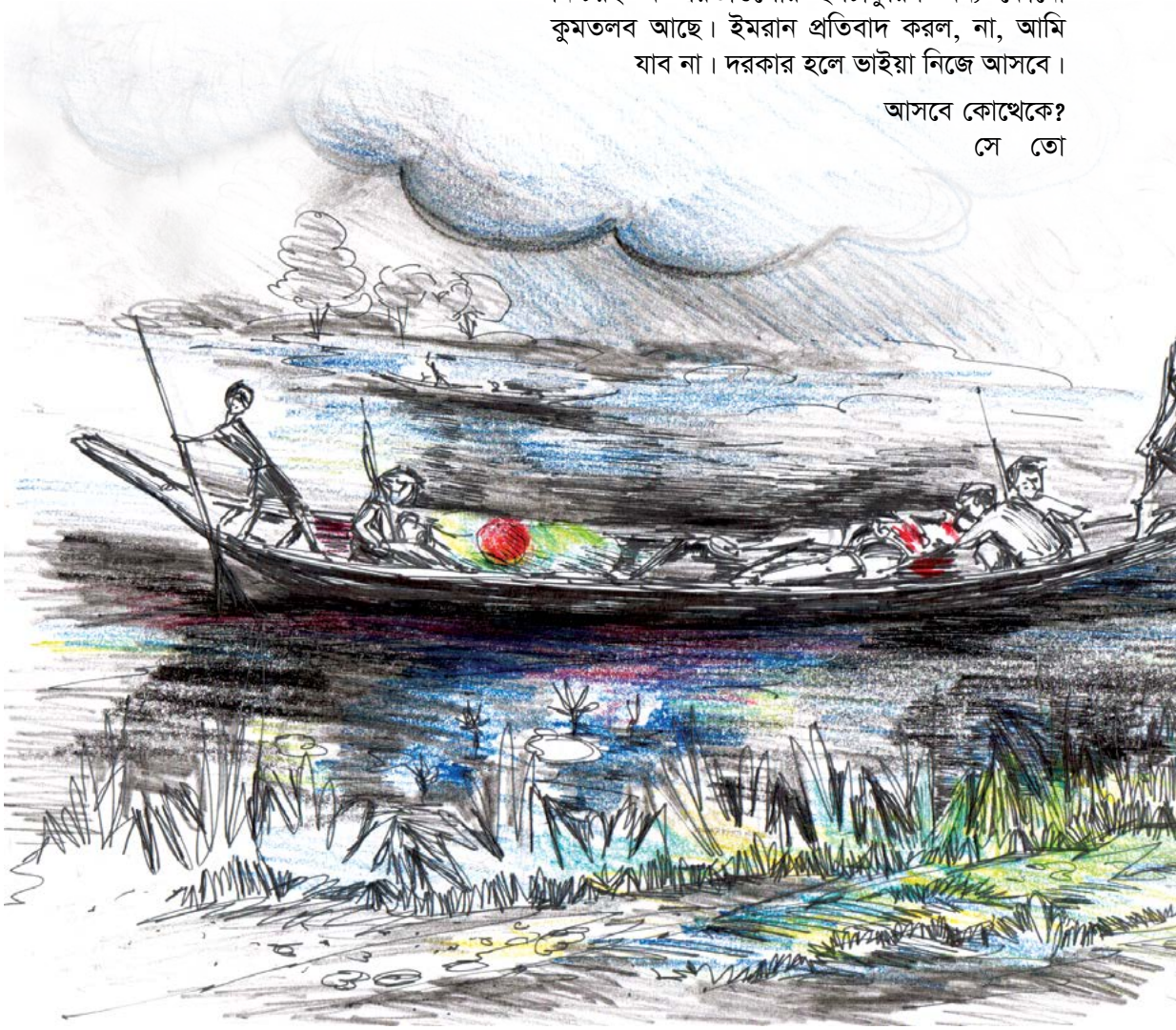

নৌকার পাটাতনে আরো একজন শুয়ে আছে। তার শরীরটা লাল-সবুজ চাদরে ঢাকা। পাশে শুইয়ে দেওয়া হলো বাদলকে। দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে আছে। কেউ কাউতে চিনতে পারছে না। নৌকা ছুটে চলছে পুবের স্রোতে। যেদিকে আকাশটা সবেমাত্র লাল হয়ে আসছে।

মরতে বসেছে।

আঁতকে উঠল ইমরান। ভাইয়ার কী হয়েছে?

তেমন কিছু না। পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পায়ে গুলি লেগেছে। তোকে যেতে বলেছে। হয়ত বাঁচবে না। তোকে দেখতে খুব মন চাইছে বাদলের।

ছোট্ট ইমরানের বুকটা কেঁপে উঠল। ইমরান জানে, এ লোকগুলো শয়তান। ক'দিন আগে বন্ধু রাজীবের বাড়িটা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। লুটপাট করেছে। রাজীবের মা-বোনদের উপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে। রাজীবরা হিন্দু বলে ওদের শাস্তি দিয়েছে। চিৎকার করে বলছে, এবার কোথায় যাবি। দেখি ইণ্ডিয়ার কে তোদের বাঁচায়? রাজীবের কাকা, ঠাকুরদাকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে পেছনে হাত বেঁধে গুলি করে মেরেছে। কী নির্মম সেই দৃশ্য! ইমরান দূরে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে এই নির্মম দৃশ্য দেখেছে।

ইমরান জোর দিয়ে বলল-তোমরা খারাপ। আমি তোমাদের সাথে যাব না।

তুই যাবি না, তোর বাপ যাবে।

এই বলে ওরা ইমরানকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেল।

যাবার সময় ইমরান বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলল, আমি গেলাম। ফিরে না আসলে মনে করবি, ওরা আমাকে মেরে ফেলেছে।

রিপনের মুখে খবরটা শুনে বাদল আর স্থির থাকতে পারেনি। এ পাড়া-ও পাড়া মিলে খবরটা চাউর হতে বেশি সময় লাগেনি। বাদলও তার সঙ্গী যোদ্ধাদের নিয়ে ইমরানকে উদ্ধার করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল।

বাদল কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে। রতন বার বার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখছে। হালকা নিশ্বাস এখনো আছে। ধীরে ধীরে পুবের আকাশটা ফর্সা হয়ে আসছে। ভোর হবার আগে যেভাবে হোক এই স্থান ত্যাগ করতে হবে। রতন বার বার ভাবছে, বাদলের অতটা সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। শত হোক আদরের একমাত্র আপন ছোটো ভাই। ছোটো ভাইকে বাঁচানোর জন্য হুট করে এমন ঝুঁকি নিতে হলো।

বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যও ঘায়েল হয়েছে। রতন ছিল বাদলের কাছাকাছি অবস্থানে। গুলি লেগে বাদল যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, কমান্ডারের নির্দেশে বাদলকে নিয়ে এই নির্জন জায়গায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। এরপর কী হলো, এখনো কেউ কিছু জানে না।

হঠাৎ একটা বড়ো ঢেকুর তুলে বাদল মাগো বলে কঁকিয়ে উঠল। রক্ত কিছুটা ধরে এসেছে। তবে বাদলের শরীরটা মনে হচ্ছে ঠান্ডা। একেবারে নিস্তেজ। বুকে

হাত দিয়ে দেখল, একটু একটু ধুক ধুক করছে। অন্ধকারও একটু একটু কাটতে শুরু করেছে। এবার বাদল পরিষ্কার কথা বলল।

আমার ভাই কই? আমার ভাই। ওর সামনে পরীক্ষা। কত করে বলেছি, পরীক্ষায় ভালো করতে হবে। কিছুই শোনে না। সারাক্ষণ শুধু মার্বেল, ডাংগুলি, ঘুড়ি ওড়ানো, কানামাছি এসব নিয়ে আছে।

তোর ভাই আছে। দেখিস ও ঠিকই লেখাপড়া করে অনেক বড়ো হবে।

তাই তো। হবে না আবার? দেখতে হবে না কার ভাই? ঐ জানোয়ারগুলো আমার জন্য আমার ভাইকে মারতে চেয়েছিল। আমার ভাইকে নিয়ে আয়। আমি একটু দেখি।

ও ঠিকই আসবে। আগে তোকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।

আমার কিচ্ছু হয়নি। প্লিজ, আমার ভাই ইমরানকে এনে দে। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আগে তুই সুস্থ হয়ে বাড়ি যা। দেখবি ও ঠিকই তোর জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি বাড়ি যাব। আমি বাড়ি যাব।

এই বলে ছোট্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠল বাদল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। পর পর আরো ক'টা ঢেকুর উঠল।

পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া খালের পানিতে হঠাৎ ছপাৎ ছপাৎ শব্দ শুনতে পেল রতন। ভাবল শত্রুসেনা নয়ত? খুব সাবধানে নিজের কোল থেকে বাদলের মাথাটা নামিয়ে রাখল। রাইফেলটা হাতে নিয়ে সতর্ক অবস্থানে থেকে খালের পাড়ে উঁকি দিল। নাহ! মুক্তির দলের লোকেরা ফিরছে। নৌকা থেকে জয় বাংলা ধ্বনি উঠল। রতন আরো কাছে খালের পাড় ঘেষে দাঁড়িয়ে নৌকা থামানোর জন্য ইশারা করল। নৌকা ভিড়ল। নেমে আসল সবাই। ধরাধরি করে বাদলকে নৌকায় তোলা হলো।

নৌকার পাটাতনে আরো একজন শুয়ে আছে। তার শরীরটা লাল-সবুজ চাদরে ঢাকা। পাশে শুইয়ে দেওয়া হলো বাদলকে। দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে আছে। কেউ কাউতে চিনতে পারছে না। নৌকা ছুটে চলছে পূর্বের স্রোতে। যেদিকে আকাশটা সবেমাত্র লাল হয়ে আসছে।

বড়োদের মুখে শুনে ছোটোদের লেখা মুক্তিযুদ্ধের কথা

# তোমরা আমাদের অহংকার

## আনিকা রহমান (বৃন্ত)

আমি গর্ববোধ করি এই জন্য যে, আমার জন্ম হয়েছে এই বাংলায়। আমি গর্ববোধ করি সেইসব বীর বাঙালিদের জন্য যাদের প্রাণের বিনিময়ে এই দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা আজ স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিত।

আমি গর্ববোধ করি কারণ আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার নাতনি। আমার পরিবার মুক্তিযোদ্ধার পরিবার। আজ আমি আমার মুক্তিযোদ্ধা নানা জনাব ফজলুর রহমান খানের যুদ্ধ চলাকালীন তার জীবনে ঘটে যাওয়া বিশেষ মুহূর্তগুলো নিয়ে কিছু লিখব।

এখানে উল্লেখ্য, আমার নানা মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুর রহমান খান ১৯৪৪ সালে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার জাবরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সেনানিবাসে সৈনিক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ফিরে আসেন সৈনিক হিসেবেই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ভাষণের পর নানা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে । নানা তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন। সেই সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আসা ছিল ভীষণ কঠিন । কিন্তু ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনারা আমাদের দেশের মানুষের উপর রাতের অন্ধকারে আক্রমণ শুরু করল । তখন নানা আর চুপ করে বসে না থেকে উনার পূর্ব পরিচিত ক্যাপটেন আব্দুল হালিম চৌধুরী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে তার অধীনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

নানা ২নং সেক্টরের অধীনে ছিলেন। তাঁর যুদ্ধের এলাকা ছিল মানিকগঞ্জের আরিচা হতে ঢাকার নবাবগঞ্জ ও দোহার পর্যন্ত । নানা যেহেতু আর্মিতে ছিলেন তাই তিনি অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেন এবং অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকেন ।

নানা প্রথমে বড়ো ধরনের যুদ্ধ করেন হরিরামপুরের সুতানালী এলাকায় । পাকি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করলে মুক্তিযোদ্ধারাও কঠোরভাবে প্রতিরোধ এবং পালটা আক্রমণ করতে থাকে । এভাবে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ হওয়ার পর এ যুদ্ধে বেশ কিছু পাকিস্তানি সেনা আহত হয় । শেষে তারা পালিয়ে যায় ।

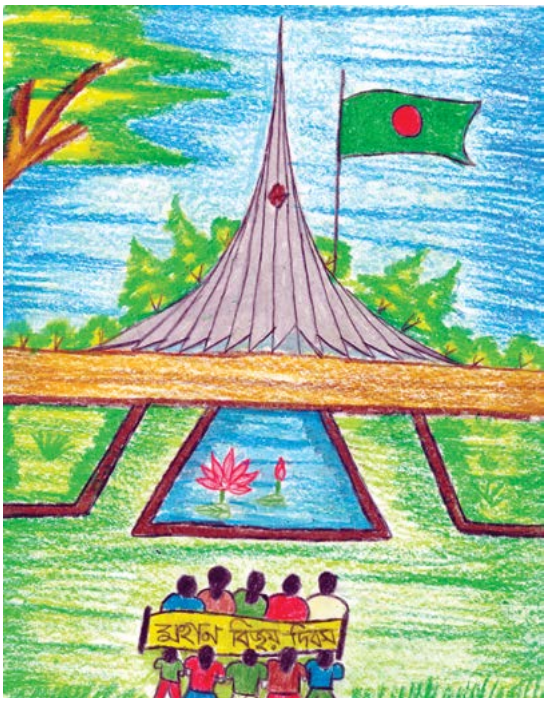


*ফারজানা আক্তার শিমলা, পঞ্চম শ্রেণি, সৃজন বিদ্যাপীঠ*

এরপর নানা এবং তাঁর হরিরামপুর ও শিবালয় এলাকার বাল্লা, মালুচী, মাচাইন, হাপানিয়া ও ইন্তাজগঞ্জ এলাকায় সারাদিন যুদ্ধ করেন নানা । মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে দিন শেষে রাতের আঁধারে পালিয়ে গিয়েছিল পাকসেনারা।

এ যুদ্ধে কয়েকজন পাকসেনা নিহত এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়। এছাড়া নানা লেছরাগঞ্জ এলাকার একটি বড়ো যুদ্ধে অংশ নেন এখানে সাত জন পাক সৈনিক নানাদের হাতে মারা যায়। সর্বশেষ বড়ো যুদ্ধ করেন আরিচার দাশকান্দি

এলাকায় ও মহাদেবপুর ব্রিজের নিকট । সেই যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের পিছু হটতে বাধ্য করে। পরে ৮ই ডিসেম্বর নানাসহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা শিবালয়ের আরিচাঘাট দখল করেন।

এভাবেই এ দেশের মুক্তিযোদ্ধা বীরসেনাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও ত্যাগের বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বীর বাঙালিদের নিকট আত্মসমর্পণ করে। সারাদেশ শত্রুমুক্ত হয় এবং আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হয়।

নানার মুখ থেকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা শোনার পর গর্বে বুক ভরে যায় আমার । আর একটি কথা না বললে লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। নানা যখন যুদ্ধে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাঁর বিধবা মাকে না জানিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর মা জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর একমাত্র ছেলে যুদ্ধে গিয়েছে । যুদ্ধে তার সন্তানের মৃত্যু হতে পারে এটা জানার পরও তাঁর মা তাকে ফিরে আসতে বলেননি। উপরন্তু যিনি তাঁর ছেলের খবর নিয়ে এসেছিলেন তাকে বলেছিলেন যে, সে যেন মায়ের জন্য চিন্তা না করে দেশ স্বাধীন করে ঘরে ফিরে। একজন মুক্তিযোদ্ধার এমন গর্ভধারিণী মাকে জানাই আমার হাজারো সালাম ।

সবশেষে আমি একটি কথা বলতে চাই, আমরা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে গর্ব করি তখন যেন তাদের আত্মত্যাগী ও সাহসী মা'দের কথাও স্মরণ করি ।

*সপ্তম শ্রেণি, উইল্‌স লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা*

# আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

**সামিয়া ইসলাম রিমি**

আমার নাম সামিয়া ইসলাম রিমি। আমি এখন মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি সংক্ষেপে লিখতে যাচ্ছি।

১৯৭১ সালে আজকের বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডটি ছিল পাকিস্তানের অধীনে। পাকিস্তান দেশটি তখন দুটি অংশ বিভক্ত ছিল। এর একটি হলো পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। শাসন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর শোষণ নির্যাতন শুরু করে। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা-১১ দফা ও অন্যান্য দাবির ভিত্তিতে তুমুল গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর নেতৃত্বাধীন দল বিপুল ভোটে জয় লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানিদের হস্তান্তর করতে না চাওয়া তাদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করে তোলে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন- 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর এ ডাকে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এক যোগে সাড়া দেয়। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ইয়াহিয়ার নির্দেশে পাকিস্তানিবাহিনী হামলা চালায় ২৫শে মার্চ মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের আগে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু ওয়্যারলেস বার্তায় বাংলাদেশে স্বাধীনতার ঘোষণা করে। এই ভিত্তিতে ২৬শে মার্চ শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় মুজিবনগর

*প্লাবন দাস, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়*

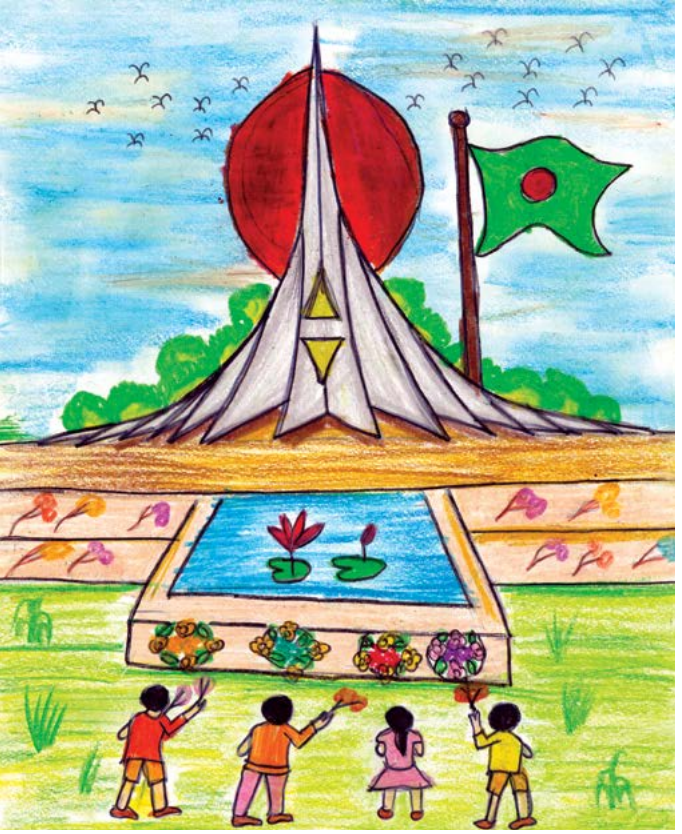

*প্রজ্জল চৌধুরী, তৃতীয় শ্রেণি, ড্যাফডিল কিন্ডার গার্টেন*

সরকার। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার শপথ পাঠ করে মুক্তিবাহিনী। বাঙালি জাতি বীর বিক্রম যুদ্ধ করে। মুক্তিবাহিনীতে সকল শ্রেণি-পেশার বাঙালিদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হন। অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন। অনেকেই ঘর বাড়ি হারান। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদর নামে পরিচিত কিছু সংখ্যাক বাঙালি পাকিস্তানিদের পক্ষে হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও বর্বর নির্যাতন চালায়। তারা যুদ্ধাপরাধী। তাদের বর্বর নির্যাতন পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর গণহত্যা মুক্তিবাহিনীকে দমাতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে আমরা পাকিস্তানির স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনি। ১৯৭১ সালে ৯ মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বহুকাঙ্খিত স্বাধীনতা বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই করে নেয় বাংলাদেশ নামক একটি নতুন রাষ্ট্র। পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা রক্ষা আমাদের সকলের কর্তব্য। বাংলাদেশ যতদিন থাকবে, এ পৃথিবী যতদিন থাকবে এ স্বাধীনতাও ততদিন থাকবে। স্বাধীনতা পৃথিবীর মানচিত্রে দিয়েছে এক খণ্ড সম্মান। পেয়েছে একটি গৌরবদীপ্ত পতাকা। স্বাধীনতা যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাংলার সন্তান শহিদ হন। আমরা তাদের সবসময় শ্রদ্ধা করব।

*পঞ্চম শ্রেণি, অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ*

## একটি মুক্তিযুদ্ধের গল্প

**মাহিরা মারজিয়া**

১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এই সময়ের ঢাকার একটি ঘটনার কথা বলি। মিনা বাজারের পিছনে পাকবাহিনীরা এসে পরেছিল। তখন কামাল নামের একটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে, তাদের নাম মিনা ও রূপা। তারা তিন বন্ধু ছিল। তারা পাকবাহিনীদের আসতে দেখে রান্না ঘরে চলে গেল এবং একটি বুদ্ধি করল। রান্নাঘরে যত মরিচের গুড়া ছিল একটি বালতিতে সব পানি দিয়ে গুলালো। এরপর এই বালতিসহ ছাদে উঠে পাকবাহিনীদের মাঝে ছিটিয়ে দিল। তাদের চোখে জ্বালাপোড়া করতে শুরু করল এবং তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। সেদিন কামাল, মিনা ও রূপা অনেক মানুষের প্রাণ বাঁচাল। এভাবেই এই ছোটো বাচ্চাগুলো সেইদিন পাকবাহিনীকে তাড়িয়ে একটি বিজয় অর্জন করল।

*স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান, ম্যাপললীফ স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা*

## ৭ই মার্চ

**ওমাইরা আলম টাইফ**

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ২৫ শে মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা বাঙালিদের উপর হামলা করে। তারা নির্বিচারে বাঙালিদের মেরে ফেলে। ফলে অনেক বাঙালি পালিয়ে ভারতে চলে যায়। ছোটো বড়ো নারী-পুরুষ সকলেই ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে ফিরে এসে গেরিলা যুদ্ধ

শুরু করে, অর্থাৎ ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ হয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে হামলা চালায়। মুক্তিযোদ্ধারা ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা সবকিছুকে অগ্রাহ্য করে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে যুদ্ধ করে। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা বিজয়ী হলাম। আমরা একটি পতাকা পেলাম। একটি দেশ পেলাম, যার নাম বাংলাদেশ। লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ। এখন আমরা এই স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক। আমাদের দেশ খুবই সুন্দর। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসব, দেশকে সম্মান করব।

*স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান, বিএসিএইচএ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা*

*ছাকিবুল ইসলাম (ইমন), অটিস্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল, সুনামগঞ্জ*

## আমার দেশ বাংলাদেশ

**নারিসা তাবাসসুম**

যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। যুদ্ধে আমাদের অনেক মা-বাবা, ভাই-বোন শহিদ হয়েছে। ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমি আমার দেশটাকে অনেক ভালোবাসি। আমি আমার মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলে গর্ববোধ করি। আমার দেশটা অনেক সুন্দর। এ দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত। এ দেশটাকে আমরা সবাই বুক দিয়ে আগলে রাখব। আমাদের দেশের পতাকা সবুজের মাঝে লাল। দেশের পতাকাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাবো। তাহলেই শহিদদের প্রতি সম্মান জানানো হবে। বাংলাদেশ আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।

*প্রথম শ্রেণি, সানিডেল স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা*

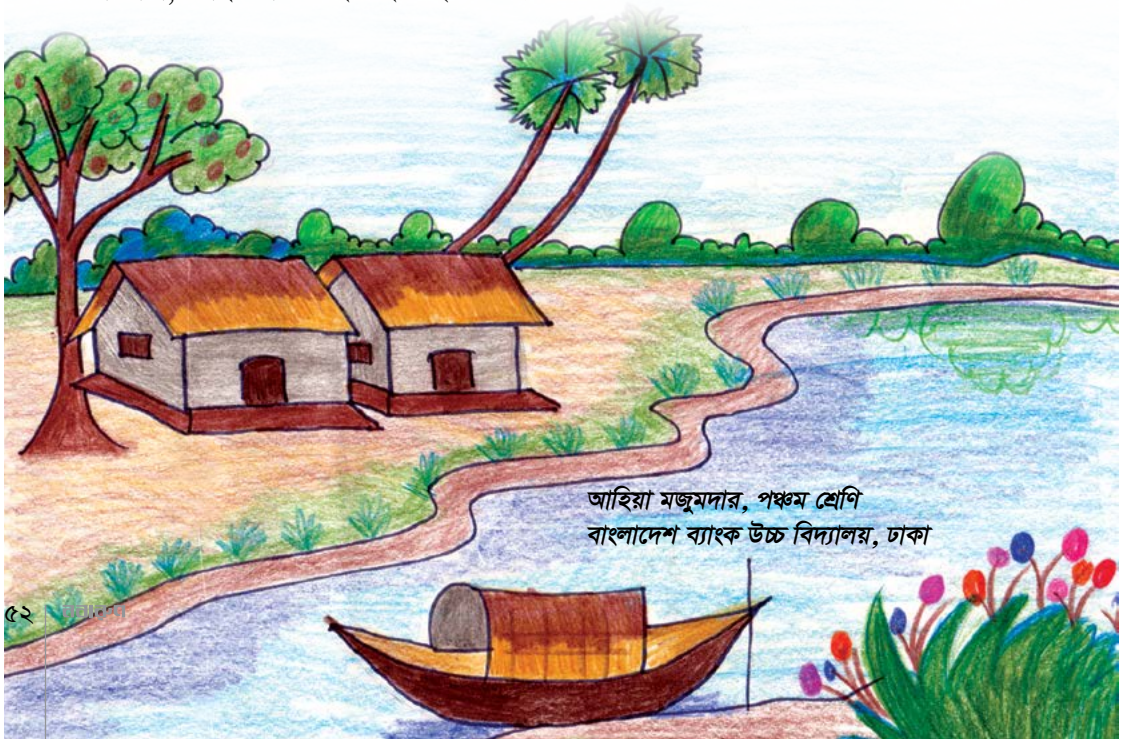

*আহিয়া মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি*
*বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা*

# মুক্তিযুদ্ধের দিন-রাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

## প্রথম পর্ব

আমাদের বড়ো চাচা। তিনি যেন এক জীবন্ত ইতিহাসের বই। ১৯৫২ তে তিনি শিশু ছিলেন। বয়স ১০-১২ হবে। তবে সবই মনে আছে তার। আর ১৯৭১ এ তো নিজেই মুক্তিযোদ্ধা।

বড়ো চাচা সিদ্ধান্ত নিলেন, গল্প বলার আসর বসাবেন। তিনি গল্প বলবেন। আমরাও বলতে পারব। কখনো বা বই পাঠের আসর। গল্পের বিষয়— ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর। আমাদের স্বাধীনতার নয় মাসের গল্প হবে। এর আগে বলেছিলেন বায়ান্ন থেকে উনসত্তর। তার আগে বলেছিলেন পলাশির প্রান্তর। তার আগে বলেছিলেন মোগল দ্যা গ্রেট।

এই আসরে আমাদের বন্ধুরাও থাকতে পারবে। মানে আমার, নুপুরের, আর শিলা আপার। নুপুর আমার ছোটো বোন। আমার চেয়ে তিন ক্লাশ নিচে পড়ে। মানে ক্লাশ ফাইভে। শিলা আপা বড়ো চাচার একমাত্র মেয়ে। পদার্থ জ্ঞিানের ছাত্রী। সাহিত্য পড়ে আর গান করে রবীন্দ্র সংগীত।

আমার বন্ধু পিপলু। খুব প্রিয় বন্ধু। ওর বড়ো চাচা আবার আমার বড়ো চাচার বন্ধু। বাল্যবন্ধু। দু'জন এক সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। পিপলু বলে-তোর বড়ো চাচা মহান মানুষ। গ্রেট ম্যান। আমার বড়ো চাচা কেমন গম্ভীর টাইপের। দেখলেই বলেন-অংক আর ইংরেজি বই নিয়ে আয়। অংক আর ইংরেজি ছাড়া তার পৃথিবীতে আর যেন কিছু নাই।

আমাদের ড্রইংরুম ভরে গেছে শ্রোতায়। আমাদের বন্ধুরা এসেছে। আমাদের মহাব্যস্ত ছোটো চাচা আর আমার বাবাও উপস্থিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছোটো চাচা ছিল ক্লাস ফাইভে। আর আমার বাবা ক্লাস সেভেন-এ। তাদেরও অনেক কিছু মনে আছে। আবার শুনতে চায়। শৈশবের আগুনঝরা স্মৃতিতে ফিরে যেতে চায়।

বড়ো চাচা গলা কাশলেন। শুরু করতে যাবেন। দরজায় বেল বেজে উঠল। আবার কে এল?

আমি গিয়ে দরজা খুললাম। পিপলুর গম্ভীর বড়ো চাচা দাঁড়িয়ে। মুখে মিষ্টি হাসি। বললেন—আমিও এলাম। স্বাধীনতার নয় মাসের গল্প হবে। আমিও তো প্রত্যক্ষ সাক্ষি।

বড়ো চাচা গিয়ে পিপলুর বড়ো চাচার সাথে বুক মেলালেন। তারা পরম বন্ধু। শিলা আপা পিপলুর বড়ো চাচাকে চা দিল। তিনি বললেন-কাপে না। বড়ো মগে চা দাও। অতটুকু কাপের চায়ে আমার কিচ্ছু হয় না।

আমরা হেসে উঠলাম। শিলা আপা বড়ো মগ ভরে চা এনে দিল।

বড়ো চাচা পিপলুর বড়ো চাচাকে বললেন-মুহিব, তুমিই না হয় শুরু করো।

পিপলুর বড়ো চাচার নাম মুবিবুল আলম। তিনি বললেন—না না, তুমি শুরু করো, আমি তো আছিই।

বড়ো চাচা শুরু করলেন—

ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানি শাসক চক্রের ষড়যন্ত্র। প্রথম থেকেই নানা রকম ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেই যাচ্ছিল। '৭০-এর নির্বাচন। আওয়ামী লীগ ১৬৭ টা আসন পেল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল। স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করবে। কিন্তু না। পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা শুরু করল তাল-বাহানা। নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না।

মার্চের ১ তারিখ। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেতারে ভাষণ দিল। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করল। মানে ঘি-এর মধ্যে আগুন দিল।

সঙ্গে সঙ্গে মুহিব চাচা বললেন-না না, হলো না।

বড়ো চাচা বড়ো চোখ করে তাকালেন তার দিকে। তিনি বললেন—আগুনের মধ্যে ঘি দিল। আগুন তো আগে থেকেই লেগে ছিল।

ও হ্যাঁ, আগুন তো জ্বলছিলই। বাঙালিরা এ অন্যায় মেনে নিতে পারল না। ঢাকা শহর হয়ে গেল মিছিলের শহর। ছাত্রলীগ আর ডাকসুর নেতারা মিটিং ডাকলেন পল্টন ময়দানে।

৫০/৬০ হাজার মানুষ রাস্তায় বের হয়ে এল। তাদের হাতে বাঁশের লাঠি, লোহার বড়ো। তারা রাস্তা জ্যাম করে ফেলল।

বড়ো চাচা মুহিব চাচার দিকে তাকালেন। বললেন—আমরাও তো ছিলাম সেই মিছিলে, তাই না?

অবশ্যই ছিলাম। তোমার হাতে রড ছিল। আমার হাতে...আমার হাতে....।

তোমার হাতে কিছু ছিল না। তুমি শুধু হাত ঊর্ধ্বে তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে স্লোগান দিচ্ছিলে-ছয় দফা মানতে হবে-জয় বাংলা।

তখন আমার বাবা বলল—আমিও তো ছিলাম ভাইয়া।

বড়ো চাচা তাকালেন বাবার মুখে। বললেন-হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও ছিলি। মিছিলে আমার পাশেই হেঁটেছিলি। তোর গলার জোর দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আমি গর্বিত হয়ে উঠলাম। আমার বাবাও ৭১-এর মার্চে মিছিল করেছে।

বাবা বললেন—গুলিস্তানের কামানের ওপর দাঁড়িয়ে অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরী আগুনঝরা বক্তৃতা দিলেন।

আমরা তো অবাক। মতিয়া চৌধুরী? মানে, এখন যিনি বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী?

হ্যাঁ, তিনিই।

বাহ! মনে আছে তাহলে?

বড়ো চাচা বললেন-স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম এমসিসি'র ক্রিকেট খেলা চলছিল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। দর্শক-খেলোয়াড় সবাই রাস্তায় বের হয়ে এল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন—সাত কোটি বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে আমি চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধি উদয় না হলে, আমরা নতুন ইতিহাস রচনা করব।

বঙ্গবন্ধু হরতাল ডাকলেন। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মিটিং-এর ঘোষণা দিলেন।

ওরকম হরতাল এই জীবনে আর দেখিনি। গাড়ি তো দূরের কথা, একটা রিকশাও চলেনি। যেন রাস্তায় মাদুর পেতে শুয়ে থাকা যাবে।

তখন ছোটো চাচা বলল-ভাইয়া, আমার কিন্তু সেই হরতালের কথা মনে আছে।

মনে তো থাকার কথা। তুই তখন ক্লাস ফাইভে। তোর পাওয়ার অব মেমোরিতো এমনিতেই ভালো।

আমি, মেঝোভাই, আরো কয়েকজন রাস্তায় ক্রিকেট খেলেছিলাম। তাই না মেঝো ভাই?

ছোটো চাচা তাকাল বাবার মুখে। বাবা বলল-ঠিক, হানড্রেট পার্সেন্ট রাইট।

বড়ো চাচা বললেন, সেই দুই তারিখেই রাত আটটা থেকে কারফিউ জারী হলো। কারফিউ চলছে। মিলিটারির গুলিতে ঝরে গেল কয়েকটি তাজা প্রাণ। রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছিল ছেলেরা। তখন শহিদ হন ফারুক ইকবাল। ক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা মালিবাগ ট্রাফিক আইল্যান্ডেই তাকে কবর দেয়। তিন তারিখে আটটি লাশ নিয়ে মিছিল হলো। শহিদমিনারে লাশ। সকালে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আদায়ের শপথ নিল। আর বিকালে লাশগুলো নেওয়া হলো পল্টন ময়দানে।

বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তিনি বলেন-নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে

হবে। না দিলে বাঙালি জাতি এক পয়সাও ট্যাক্স দিবে না। পল্টনে সেদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীত হিসেবে-আমার সোনার বাংলা গাওয়া হয়।

হরতাল চলাকালীন সময়ে মানুষের অসুবিধার কথা ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাই সরকারি ও বেসরকারি অফিস দুইটা থেকে চারটা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। বেতন নেবার সুবিধার্থে। এছাড়াও জরুরি সেবাগুলো খোলা ছিল। মূলত পূর্ব বাংলা চলছিল বঙ্গবন্ধুর আঙুলি হেলানোর তালে।

ওদিকে ষড়যন্ত্রকারীরা বসে নেই। সিন্ধু প্রদেশের লারকানায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর পৈত্রিক বাসভবন 'আল মারকান প্যালেস'। সেখানে ইয়াহিয়া-ভুট্টো গোপন বৈঠকে মিলিত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিল। সেটা মার্চের ৬ তারিখ। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিবেন। সে প্রেক্ষিতেই ইয়াহিয়ার সেই ভাষণ।

কেউ কেউ আশা করেছিল, ইয়াহিয়া সন্তুষ্ট হবার মতো কিছু বলবে। শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠন করতে আহ্বান করতে পারে। কিন্তু না। বাংলার মানুষকে সন্তুষ্ট করতে ওদের কোনো ইচ্ছা নেই। ওরা বাংলার মানুষকে কখনোই নিজের দেশের মানুষ ভাবতে পারেনি। ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনে সবাই নতুন করে ক্ষুব্ধ। কেননা, তিনি সমস্যার জন্য শেখ মুজিবকেই দায়ী করলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে শেখ মুজিব যেন অন্যায় করে ফেলেছেন। তিনি সেনাবাহিনী দিয়ে বাংলার মানুষকে শায়েস্তা করার হুমকিও দিলেন। একটুখানি আশার বাণী হলো, ২৫শে মার্চ অধিবেশন বসার ঘোষণা এল।

মুহিব চাচা বললেন,আর সেদিনই ইয়াহিয়া এক নির্দেশে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসানকে অপসারণ করলেন। তার জায়গায় নিয়োগ দিলেন 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে খ্যাত লে. জে. টিক্কা খানকে। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি তাকে শপথ পাঠ করাননি। নির্বাহী আদেশে সে মার্শাল ল' জারি করে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতে লাগল।

এল ৭ই মার্চ। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ্যতম ভাষণগুলোর একটি ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ। ধারণা করা হয়, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ লাখ মানুষ হয়েছিল। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মানুষ এসেছিল। ২৪ ঘণ্টা, ৪৮ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে সেই জনসভায় এসেছে লোকজন। শুকনো চিড়া, মুড়ি, গুড় এসব খাবার খেয়ে কাটিয়েছে। এক দল অন্ধ তরুণ। মিছিল করে সেই বক্তৃতা অনুষ্ঠানে এসেছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার। দেশপ্রেম কি জিনিস!

ফস করে পিপলু বলল-বড়ো চাচা, আপনারা ছিলেন সেই ভাষণের সময় পল্টন ময়দানে?

-তাহলে আর বলছি কী? সারারাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বানিয়েছিলাম।

বাবা বললেন-আমিও ছিলাম।

ছোটো চাচা বললেন-আমি ছিলাম বড়ো ভাইয়ার কাঁধে।

আমি বললাম-বাহ! তিন ভাই-ই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঐহিতাসিক ভাষণের ময়দানে!

বড়ো চাচার চা খাওয়া শেষ। কাপ নামালেন পাশে। বললেন,বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, ...গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ-ই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ...রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম-এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

ঠিক তখন...। আমার বন্ধু তুহিন ঝট করে দাঁড়িয়ে হাত উত্তোলন করে বলল—জয় বাংলা।

আমরাও বলে উঠলাম—জয় বাংলা।

আমারা যেন সেই মুহূর্তে উপস্থিত। নিজেদের অজান্তেই আমরা কয়েকবার স্লোগান দিয়ে ফেললাম।

বড়ো চাচা বললেন—জনগণের কিছু অংশ আশা করেছিল, ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনার ঘোষণা দিবেন। এটা ছিল জনগণের আবেগ। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান আকাশস্পর্শী এক নেতা। তিনি আবেগে চলতে পারেন না। তাঁর ছিল দূরদর্শী ক্ষমতা। তিনি যদি সেদিন গণপরিষদে যোগদানের অস্বীকৃতি জানাতেন। সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বসতেন। সেটা হয়ে যেত বিরাট এক ভুল। সেটা হয়ে যেত রাষ্ট্রদ্রোহিতা। স্বাধীনতা আন্দোলন হয়ে যেত একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। শেখ মুজিব হতেন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা। আন্তর্জাতিক সমর্থন পাওয়া সম্ভব হতো না। স্বাধীনতা হয়ে যেত সুদূর পরাহত।

**আমার বন্ধু তুহিন ঝট করে দাঁড়িয়ে হাত উত্তোলন করে বলল—জয় বাংলা। আমরাও বলে উঠলাম—জয় বাংলা।**

বঙ্গবন্ধু শর্তাধীনে গণপরিষদে যোগদানের কথা বললেন। আবার এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম-কথাটাও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। তিনি সকল মহলকেই সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মার্চের নয় তারিখ। 'স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সমন্বয় কমিটি'র উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আয়োজিত সভা। মওলানা ভাসানী স্বাধীনতার দাবী তোলেন। তিনি বলেন-'বর্তমান সরকার যদি ২৫শে মার্চের মধ্যে আপোশে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা না দেয়, তাহলে '৫২ সালের মতো মুজিবের সঙ্গে একযোগে বাংলার মুক্তি সংগ্রাম শুরু করব।' তিনি আরো সুন্দর একটা কথা বলেন—'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়ে বাংলার নায়ক হওয়া অনেক বেশি গৌরবের।'

আসলে তখন স্বাধীনতার জন্য জেগে উঠেছে আপামর জনগণ। সে আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন কবি-সাহিত্যিকরাও। তারা গড়ে তুলেছিলেন 'লেখক সংগ্রাম শিবির' নামে একটি কমিটি। শিল্পীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে মিটিং, মিছিল, গণসংগীতের অনুষ্ঠান ইত্যাদি করছেন। তারাও গঠন করেছিলেন-বিক্ষুব্ধ সংগ্রাম পরিষদ।

২১শে মার্চ। ভুট্টো এলেন পূর্ব পাকিস্তানে। কড়া মিলিটারি পাহারা। এসেই ভুট্টো ইয়াহিয়ার সাথে দুই ঘণ্টা বৈঠক করলেন।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো এই বাংলায় মানুষ চায় না। তারা চায় সোনার বাংলার চির উর্বর সোনাফলা মাটি।

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টো বৈঠক চলছে। এদিকে চলছে বাঙালির আন্দোলন। সর্বশ্রেণি ও সর্বপেশার মানুষ আন্দোলনে সামিল। আর বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে বাঙালি-বিহারি খুনোখুনি। মূলত সেনাবাহিনী বিহারিদের উসকে দিচ্ছিল। তাদেরকে সমর্থন করছিল।

বাঙালিরা বুঝে গিয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেই হবে। তারা তলে তলে যুদ্ধের প্রস্তুতিও নিতে শুরু করে। ২০শে মার্চ। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন গণবাহিনীর কুজকাওয়াজ হলো। রাস্তার দু'ধারের হাজার হাজার মানুষ। তারা হাত তালি দিয়েছে।

২৩শে মার্চ। বঙ্গবন্ধু তাঁর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন। কুচক্রিদের সাথে আর কোনো আপোশ নয়। তিনিও স্বাধীনতার এক দফা দাবিতে চলে এসেছেন। ঢাকার প্রায় সব অফিস-বাড়িতে উড়ছে স্বাধীন বাংলার পতাকা। এমনকি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালেও। ইয়াহিয়া-ভুট্টোও তখন ঢাকায়। বিদেশি দূতাবাসগুলোতেও বাংলাদেশের পতাকা উড়তে লাগল। শহিদমিনারের ধাপে ধাপে লাগান হয়েছিল কামরুল হাসানের আঁকা কিছু দুর্দান্ত পোস্টার। সে সব পোস্টারে আঁকা ইয়াহিয়ার মুখ। নিচে লেখা—এদেরকে খতম করতে হবে। ভুট্টো-ইয়াহিয়া নীরব দর্শক। মিলিটারিও তাই। কিন্তু কেন? কারণ, তারা চূড়ান্ত মরণ কামড় দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

আলোচনার নামে কালক্ষেপণ। ইয়াহিয়ার ভণ্ডামি। শেখ মুজিব প্রতিদিন সাদা গাড়িতে কালো পতাকা উড়িয়ে যান। বেরিয়ে এসে বলেন—আলোচনা এগোচ্ছে। আর ওদিকে আন্দোলনকারী বাঙালি জনতাকে বলেন—দাবি আদায়ের জন্য আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যান।

তলে তলে প্লেনে করে আসতে থাকে হাজারে হাজারে সৈন্য। চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র বোঝাই করে এসে ভিড়তে থাকে জাহাজ। বীর বাঙালি সে অস্ত্র খালাস করতে বাধা দেয়। রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়। আর্মি তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে।

২৫ মার্চ অধিবেশন হলো না। ইয়াহিয়া পালিয়ে গেল। কাউকে না জানিয়ে চোরের মতো পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে সর্বাধিনায়ক হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম ঘৃণিত এক গণহত্যার দলিল 'অপারেশন সার্চ লাইট' এ স্বাক্ষর করে গেল।

২৫শে মার্চ। এল সেই ভয়ঙ্কর কালরাত।

বড়ো চাচা কণ্ঠ থেমে গেল। বিষণ্নতার ছায়ায় ঢেকে গেল তার মুখ। তিনি মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

মুহিব চাচা তারপর থেকে বলে গেলেন—আচানক ঘুমন্ত মানুষ ভীষণ ভয় নিয়ে জেগে উঠল। ভীষণ শব্দ। বোমার বুমবুম আওয়াজ। মেশিনগানে ঠাঠাঠাঠা আওয়াজ। চি-ইইইই করে আরেকটা শব্দ। ট্রেসার হাউইয়ে। সেই সাথে আলোর ঝলকানি। সেই আলো লক্ষ্য করে ছুটে যায় গোলাগুলি। আকাশছোঁয়া আগুনের শিখা। মানুষের আর্তচিৎকার।

মানব ইতিহাসে এ এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ গভীর রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। গণহত্যার মোকাবিলার ডাক দিলেন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। বিশ্ব জেনে গেছে, পাকিস্তান সরকারের মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা। এখন আর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলার সুযোগ নেই। শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা বলার সুযোগ নেই। সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানের কাছে পৌঁছল। তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই জন্যই ২৬শে মার্চ হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা ঘোষণার পরই বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলেন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো পশ্চিম পাকিস্তানে।

মুহিব চাচা থামলেন। বড়ো চাচা মাথা তুললেন। বললেন– কারফিউ-এর জন্য আমরা বাইরে বের হতেই পারছিলাম না। মানুষের ছায়া দেখলে মিলিটারিরা গুলি করে। আমি আর মুহিব বের হয়েছিলাম ২৯ তারিখ সকালে। গিয়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর শাঁখারি বাজার এলাকায়।

বড়ো চাচা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কথা বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। হাতের উলটো পিঠে চোখ মুছতে লাগলেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ হলই কামানের গোলায় ধ্বংস প্রায়। শহিদমিনার, আমাদের সব সংগ্রামের চেতনার প্রতীক। একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে। হলগুলোতে সার বেধে পড়ে আছে ছাত্রদের লাশ। শিক্ষকদের কোয়ার্টারও তসনস। অনেক শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। আর শাঁখারি বাজারে ডোমদের দেখেছি ট্রাক বোঝাই করে লাশ তুলে নিচ্ছে। পুরুষের লাশ। নারীর লাশ। শিশু-কিশোরদের লাশ। পঁচা, গলিত লাশগুলো ডোমরা কাঁটা দিয়ে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ট্রাকে তুলছিল। লাশগুলো ঝাঁজরা।

মুহিব চাচা উপসংহারে বললেন– এতক্ষণ তোমরা যা শুনলে তা হলো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ঘটনা। জানলে মার্চের ২৫ তারিখ পাকিস্তানি আর্মিরা কেমন পশু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আছে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কথা। আছে আমাদের বিজয়ের গাঁথা। কিন্তু শুধু বিজয়ের গর্বে বুক ফুলিয়ে রাখলে চলবে না। সে অহংবোধ আমাদের থাকবে। আমাদের সেই দুঃখ-কষ্ট, হারানোর বেদনা, লাঞ্ছনা-অপমান সে সবও জানতে হবে। এই বাংলায় এখনও সেইসব শকুনের পাখার ছায়া উড়ে উড়ে যায়। এখনও কালসাপ হয়ে ছোবল হানার অপেক্ষায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। তোমাদের ওদেরকে চিনতে হবে। ওদের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত করতে হবে। তোমাদের ঘৃণার অনলেই হবে ওদের অস্তিত্বের চূড়ান্ত বিনাশ।

শোনো, আগামী আসরে বলা হবে ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের ঘটনাবলি। আর সে আসর বসবে আমার বাসার বৈঠকখানায়। এপ্রিল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মের টার্নিং পয়েন্ট শুরু হয়। কীভাবে ঘটেছিল ঘটনাগুলো, জানতে চাও না?

আমরা সবাই এক সাথে বলে উঠি, জানতে চাই!

হাসলেন মুহিব চাচা। বড়ো চাচাও।

# ছোটোদের আয়োজনে চলচ্চিত্র উৎসব

## নাবীল অনুসূর্য

২০০৯ সালের কথা। মাসুদ আল কাওসার ও শুভজিৎ ভৌমিক কলেজপড়ুয়া দুই বন্ধু। মাথায় সিনেমা বানানোর পোকা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। শর্টফিল্ম বানানোর জন্য চমৎকার একটা আইডিয়াও ছিল ওদের মাথায়। একটু কষ্ট করে ক্যামেরা না হয় জোগাড় করা যাবে। কিন্তু বানানোর পর দেখাবে কোথায়! তখনো তো ইউটিউব-ভিডিওর যুগ আসেনি। হঠাৎই তারা জানতে পারল, ঢাকায় একটা বেশ বড়ো ধরনের চলচ্চিত্র উৎসব হবে। নাম 'চিলড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। সেটা ছিল উৎসবের দ্বিতীয় আসর। তাতে দশ-বারোটা ভেন্যুতে দেশ-বিদেশের কয়েক শত সিনেমা দেখানো হবে। সেখানে শিশুরাও তাদের নির্মিত চলচ্চিত্র জমা দিতে পারবে। বাছাই করা সিনেমাগুলো দেখানো তো হবেই, সেরা পাঁচ চলচ্চিত্রকে পুরস্কৃতও করা হবে। পুরস্কার নিয়ে অবশ্য ওদের তেমন গরজ ছিল না। ওদের সিনেমা দেখানো যাবে, সেই উৎসাহেই ওরা সিনেমাটা বানিয়ে ফেলল। পথশিশুদের উপর নির্মিত শর্টফিল্মটির নাম দিয়েছিল 'ওরা'।

জমা দিতে গিয়ে জানা গেল আরো আশ্চর্যজনক খবর। এই উৎসবের আয়োজক 'চিলড্রেন'স ফিল্ম সোসাইটি, বাংলাদেশ'। সংক্ষেপে সবাই ডাকে 'সিএফএস' বলে। নামটা অবশ্য বাংলাতেই দিতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু 'শিশু চলচ্চিত্র সংসদ' নামে আগে থেকেই সংগঠন আছে বলে নামটা ইংরেজিতেই রাখতে হয়েছে। এই সংগঠনের সদস্যদের বেশিরভাগই শিশু। কাজও বেশিরভাগ তারাই করে। পুরো উৎসবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন 'দীপু নাম্বার টু'র পরিচালক মোরশেদুল ইসলাম ও আলোকচিত্রী মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। এর বাইরে অল্প কিছু বড়ো মানুষ আছেন। তারা মূলত ছোটোদের দেখাশুনা করেন, আর তাদের দেখিয়ে দেন কোন কাজ কীভাবে করতে হবে। বাকি সব কাজ ছোটোদের। দেখেশুনে কাওসার আর শুভজিতের যত বন্ধুবান্ধব, সবাই দলবেঁধে উৎসবের ভলান্টিয়ার হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হলো, এই উৎসবে তো সিনেমা দেখতে আসে সব শিশুরা। সে জন্য তাদের বাবা-মার কাছে বায়না করতে হবে, তারপর বাবা-মা রাজি হবেন, সিনেমা দেখতে আসার জন্য সময় বের করবেন, তারপর মিলবে সিনেমা দেখার সুযোগ। ফলে খুব বেশি শিশুর পক্ষে তো সিনেমা দেখা সম্ভব হবে না। তাহলে উপায়? সে ব্যবস্থাও আছে। ফেস্টিভ্যাল থেকে সরাসরি যোগাযোগ করা হয় স্কুলগুলোর সাথে। আসা-যাওয়ার জন্য বাসও পাঠিয়ে দেয়া হয়। বাচ্চারা স্কুলের কাছাকাছি কোনো উৎসব ভেন্যুতে গিয়ে সিনেমা দেখে। এমনি একবার স্কুলের সবার সাথে সিনেমা দেখতে এসেছিল আবরার। তবে এক স্কুল থেকে একবারই বাচ্চাদের নিয়ে আসা হয়, যাতে অনেকগুলো স্কুলের বাচ্চাদের সিনেমা দেখানো যায়।

এমনি হাজারো শিশুর হাজারো গল্প আছে সিএফএসকে নিয়ে। কেউ এই উৎসবে এসে সিএফএস পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে, কেউ এখানে এসে মাথায় সিনেমার পোকা নিয়ে ফেরত গেছে, কারো প্রথম সিনেমার প্রদর্শনী হয়েছে এই উৎসবে, কারো সিনেমা দেখার স্বাদই বদলে গেছে, কারো বদলে গেছে জীবন সম্পর্কে ভাবনা, যাকে বলে চোখ খুলে গেছে। সোজা বাংলায় বললে, এই এক উৎসব প্রতি বছর হাজার হাজার

শিশুদের সংস্কৃতিমনা করে তুলছে। চিলড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল মূলত শিশুদের সেই আলোকিত সাংস্কৃতিক পরিবেশের খোঁজটাই দিয়ে দেয়। যারা উৎসবটাতে কাজ করে, তারা তো রীতিমতো সেই পরিবেশের একটা লোভেই পরে যায়। আর এই সাংস্কৃতিক পরিবেশটাই তাকে একজন ভালো আদর্শবান পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

এই উৎসব কেবল শিশুদের আলোকিতই করছে না। উৎসবে যে শিশুরা কাজ করছে, তাদের মধ্যে একই সাথে গড়ে উঠছে দায়িত্বশীলতা এবং নেতৃত্বের গুণ। প্রবল উৎসাহে আর উদ্যমে গত ১০ বছর ধরে নিয়মিত আয়োজিত হয়ে আসছে চিলড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। অবশ্য এখন আর তাদের কিছুই করা লাগে না। ছোটোরা এখন পুরো উৎসবেরই হাল ধরেছে। ৭ম আসর পর্যন্ত উৎসব পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন মোরশেদুল ইসলাম নিজেই। তারপর থেকে সে দায়িত্বও নিয়েছে ছোটরা।

এবারের ১১তম চিলড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৭ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত। তো এবার তো মুন্নী আন্টি আর মোরশেদ আঙ্কেল উৎসবের আগে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন। উৎসবের আগের দিন, মানে ১ ফেব্রুয়ারি রাতে উৎসবের মূল ভেন্যু পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখেন, ওমা! সব ঠিকঠাক। আয়োজনে কোনোই কমতি নেই। বাছাই শেষে ৫৮টি দেশ থেকে দুইশত এর বেশি সিনেমার সবগুলো রেডি হয়ে গেছে প্রদর্শনের জন্য। এবারে সব মিলিয়ে মোট ৬টি ভেন্যুতে শিশুদের জন্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। সেগুলোতে মা-বাবাদের হাত ধরে শিশুরা তো এসেছিলই, সাথে বেশ কয়েকটি স্কুল থেকেও প্রতিদিন উৎসবের বাসে করে শিশুরা সিনেমা দেখতে এসেছে।

এবারের উৎসবে প্রতিযোগিতা বিভাগের জন্য সারা দেশ থেকে শিশুদের নির্মিত ৬৮টি চলচ্চিত্র জমা পড়ে। তার মধ্যে থেকে বাছাই করা ২১টি সিনেমা দেখানো হয়েছে উৎসবে। সেগুলো থেকে উৎসবের সেরা চলচ্চিত্র বাছাই করার জন্য পাঁচজনের একটা জুরি বোর্ড গঠন করা হয়েছিল। এই জুরি বোর্ডের সদস্যরাও সবাই ছিল শিশু। তাদের বিচারে এবারের উৎসবের সেরা চলচ্চিত্র নির্বাচিত হয়েছে এস এম আজমাইন আওসাফ অর্ণবের পরিচালিত 'ওয়ান টু থ্রি'। সাথে প্রথম রানার আপ হয়েছে ইশমাম নাওয়ারের 'ফ্রেন্ড' এবং দ্বিতীয় রানার আপ হয়েছে সামিন কাদেরের 'শ্যাডো'। এছাড়াও সেরা পাঁচে থেকে বিশেষ পুরস্কার পেয়েছে শারমিন আকতার তনিমার 'ফিল্ম ক্রেজি' এবং ফাহিম আহমেদের 'জার্নি বাই লাইফ'।

এর বাইরে ১৯ থেকে ২৫ বছর বয়েসি নির্মাতাদের নিয়ে আয়োজন করা 'ইয়ং বাংলাদেশী ট্যালেন্ট' বিভাগে সেরা হয়েছে তানজিনা রহমানের 'ফিউনারেল'। এর বাইরে 'সোশ্যাল ফিল্ম' সেকশনে এবার 'নারীর প্রতি সহিংসতা' বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতায় সেরা হয়েছে ফারহা জাবিন ঐশীর 'ড্রেড'। আর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে অংশ নিয়েছে দেশের বাইরের ১৪৯টি চলচ্চিত্র। এই বিভাগের জন্য তিন সদস্যের জুরি বোর্ডে ছিলেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, অরুন গুপ্তা ও মেজবাউর রহমান সুমন। তাদের বিচারে সেরা ফিচার ফিল্ম নির্বাচিত হয়েছে গোলব্লাটের 'ওয়ালে'। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হয়েছে ম্যাক্সিম উবার্টের 'দ্য বীপ টেস্ট'। আর সেরা পরিচালকের তকমা জিতেছেন আদ্রিয়ান গোইজিঙ্গার, তার 'দি বেসটে আলার ভেলটেন' চলচ্চিত্রের জন্য। এছাড়াও 'আয়রনি' চলচ্চিত্রের জন্য এই বিভাগে সেরা শিশু নির্মাতার পদক জিতেছেন রাধেয়া জেগাথেভা।

শুধু তাই না, উৎসবের অংশ হিসেবে অনেকগুলো সেমিনার ও কর্মশালাও হয়েছে। সেগুলোতে অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশি-বিদেশি নির্মাতা ও ব্যক্তিত্বগণ। তাদের মধ্যে আছেন যুক্তরাজ্যের মার্ক বিশপ, ভারতের অরুন গুপ্তা এবং বাংলাদেশের নির্মাতা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী, তৌকির আহমেদ, নাজমুন নাহার, গায়ক অর্নব আর তিন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা পদ্ম রাণী, আলম তালুকদার ও মজিবর রহমান মানিক।

এক কথায় বললে, এগারতম এই আসরেও আয়োজনে কমতি ছিল না একটুও। অথচ এবার কিন্তু পুরো আয়োজনটাই করেছে শিশুরা। বড়োরা ছিল কেবল নামেই। তাই বলছিলাম, ছোটোরা দায়িত্ব নিতে পারে না– এটা যে কত বড়ো ভুল ধারণা, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই চিলড্রেন'স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল; 'ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন' শ্লোগান নিয়ে ছোট্টদের আয়োজনে ছোট্টদের জন্য অসাধারণ এক চলচ্চিত্র উৎসব।

## আমার কিছু কথা আছে...

সবসময় শুনে এসেছি, মন দিয়ে লেখাপড়া করে ভালো রেজাল্ট করতে হয়। আমি ছোটোবেলা থেকে তা-ই করছি। কিন্তু এখন কেবল শুনি, পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি ফাঁস হচ্ছে। যারা ফাঁস হওয়া প্রশ্ন জোগাড় করে পরীক্ষা দিচ্ছে, তারা কি অন্যায় করছে না? তারা কেন ভালো রেজাল্ট করবে?

*—অনন্যা আতিক রহমান, নবম শ্রেণি।*

নবারুণ: বন্ধু অনন্যা, তোমাকে অভিনন্দন একদম সত্যিটা বলার জন্য। পরীক্ষায় যে কোনো উপায়ে অসাধু উপায় গ্রহণ করা কেবল অন্যায় নয়, মহাঅন্যায়। জীবনে তো কত কত পরীক্ষা আছে। লেখাপড়া না শিখলে জীবনের আসল পরীক্ষাতেই তো হেরে যাবে তারা। সেই পরীক্ষা হচ্ছে, নিজের কাছে নিজের জিতে যাওয়ার পরীক্ষা। আর কেউ না জানুক, তারা তো জানবে, তারা আসলে কিছুই শেখেনি, সত্যি সত্যি ভালো রেজাল্ট করেনি। পরে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাবে, কিছু না জানলে সুযোগ পাবে কীভাবে? বিদেশে পড়তে যেতে চাইলে ধরা পড়ে যাবে আসল জ্ঞান। এভাবে জীবনের প্রতি পদে থমকে যেতে হবে তাদের। মনে রেখ, জ্ঞান অর্জনের কোনো শর্টকাট রাস্তা নেই, কখনো ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

তুমি এবং তোমার মতো লাখো বন্ধুরা জিতে যাবে অনায়াসে। কেননা, তোমরা সৎ এবং পরিশ্রমী। তোমাদের জন্য আগাম উপহার হিসেবে দিচ্ছি নিচের গল্পটি। শুভেচ্ছা রইল তোমাদের জন্য।

# প্রশ্ন ফাঁস

**কবির কাঞ্চন**

এই মিলি, ওটা কি? দেখি, দেখি! তোর হাতে আগামীকালের ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্নপত্র!

মিথিলা বিস্মিত হয়ে বলল।

মিলি কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল,

- এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন তুই কিছুই জানিস না। এটা আগামীকালের প্রশ্নপত্র। এসএসসিতে কী প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিসনি!

-না, আমি ওভাবে পরীক্ষা দেয়াকে বড়পাপ বলে মনে করি। পরীক্ষা দেব নিজের মেধা যাচাইয়ের জন্য। প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিয়ে লাভ কী?

- তোকে এতদিন খুব চালাক ও মেধাবী ভাবতাম। এখন দেখছি তুই একটা বোকা। তা না হলে প্রশ্ন পেয়ে কে এই সুযোগ হারায়? আগামীকাল যখন দেখবি আমরা যারা প্রশ্ন পেয়ে সিলেক্টেড উত্তর শিখে খাতা ভরিয়ে দিচ্ছি তখন তুই আংশিক উত্তর লিখে শুধু আফসোসে পুড়ে মরবি।

প্রিয় বান্ধবীর এমন অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে মিথিলা মনে খুব কষ্ট পায়।

মিথিলা শান্ত মেয়ে। পড়াশুনায় ভালো। দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকে। পড়াশুনার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ওর ভালো লাগে। মিথিলা জানে, ওর বন্ধু-বান্ধবীদের কেউ কেউ এভাবে ওর বইপাগল হওয়াকে পছন্দ করে না। মিলি তাদের মধ্যে একজন। সে মেধাবী বটে কিন্তু পড়াশুনায় তার একাগ্রতা নেই। মজায় মজায় কোনোমতে সময় পার করে দিয়েই সুখ খোঁজে সে। আবার পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে সাজেশনের জন্য মরিয়া হয়ে যায়। কথা বলায় ওর সাথে কেউ পেরে ওঠে না। সুযোগ পেলেই কথার মারপ্যাঁচে নিজের কথাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

মিলি আবার বলল, আচ্ছা মিথিলা! বলতো এসএসসিতে তোর জিপিএ কত?

মিথিলা নিচুস্বরে বলল, ৪.৭৫

মুখে ভর্ৎসনার হাসি এনে মিলি বলল, যা ভেবেছিলাম। তুই তো আবার নিজ থেকে পরীক্ষা দিস। মেধাবীদের কোনো প্রশ্ন, সাজেশন লাগে না। আমি কিন্তু তোর মতো অত মেধাবী না। তবু জানিস! এসএসসিতে জিপিএ ৫.০০ (গোল্ডেন)।

মিলির কথাগুলো মিথিলার কানে বিষের মতো বাজছিল। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা বাসায় ফিরে সে। মেয়ের গোমড়ামুখ দেখে মা, রেহেনা বেগম এগিয়ে এসে বললেন, কিরে মা, তোকে এমন লাগছে কেন? কোনো সমস্যা?

মিথিলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, মা, দিনরাত জেগে থেকে পড়াশুনা করে কী হবে?

মিথিলার কথা শুনে রেহেনা বেগম চোখ কপালে তুলে বললেন, এ কেমন কথা, মা! পড়াশুনাই তো অমূল্য সম্পদ। হঠাৎ করে এমন ভাবনাই বা কেন এল?

মা, আজ কলেজ হতে ফেরার পথে মিলির সাথে কথা হয়। তুমি তো জানো ও লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহী না। সাজেশন নির্ভর পড়ে। আজ ওর হাতে দেখলাম আগামীকালের ইংরেজি বিষয়ের প্রশ্ন।

কী বলিস! ও কীভাবে প্রশ্ন পাবে?

না মা, আজ আমি নিজে ওর হাতে প্রশ্ন দেখেছি। ও আমাকে অনেক সেধেছে। কিন্তু আমি নেইনি। মা, তুমিই বলো না, প্রশ্ন পেয়ে পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ ফাইভ পেয়ে কী লাভ!

রেহেনা বেগম মেয়ের এমন উপলব্ধিতে বেশ খুশি হলেন। তিনি খুশি মনে বললেন, এ নিয়ে মন খারাপ করার কোনো কারণ নেই। যে নিয়মিত পড়াশুনা করে তার ফলাফল সব সময় ভালো হয়। এটাই স্বাভাবিক।

মা, ও আমার এসএসসির রেজাল্ট নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছে।

শোন, ও গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে ঠিকই। তুমি হয়তো তা পাওনি। কিন্তু মনে রেখো ওর আর তোমার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে চাকরি লাভের ক্ষেত্রে। তখন তুমি যেখানে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবে সেখানে ওকে দেখবে হায়-হুতাশ করছে।

মিথিলা মায়ের সাথে একমত হয়ে পড়ার রুমের দিকে পা বাড়ায়।

পরদিন যথাসময়ে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেলো। মিলি প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে মহা টেনশনে পড়ে গেলো। গতকাল যে প্রশ্নপত্র সে পেয়েছিল তার সাথে এই প্রশ্নের কোনো মিল নেই। আফসোস করতে করতে তার প্রায় ঘন্টাখানেক সময় কেটে গেলো। অবশিষ্ট সময় বানিয়ে বানিয়ে লিখে পার করে দিলো সে। আর মিথিলার সবপ্রশ্ন কমন পড়েছে। সে মনের আনন্দে পরীক্ষা দিয়ে হাসিমুখে বের হয়।

মিথিলার হাসিমাখা মুখে চোখ পড়তেই মিলি লজ্জায় মুখ লুকাতে চেষ্টা করে।

# বইমেলায় ‘কিশলয়’ চমক!

**জান্নাতে রোজী**

পুরো ফেব্রুয়ারি জুড়ে ছিল বাঙালির প্রাণের মেলা বইয়ের মেলা। উৎসবমুখর একটা পরিবেশ পুরো বাংলা একাডেমি আর সোহরাওয়ার্দী চত্বরে জুড়ে। কিন্তু আজকের সকালটা যেন একটু অন্যরকমভাবে শুরু হয়েছে। পাতা ঝরা বসন্তের ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়ায় মেলার আকাশটা যেন অন্য যে-কোনো দিনের চেয়ে অনেক বেশি আলোকজ্জ্বল, অনেক বেশি দীপ্তিময়। কিন্তু কেন? একটু পরেই তা আবিষ্কার করল সবাই। চঞ্চল, উচ্ছল, শুভ্র, সুন্দর, স্নিগ্ধ একঝাঁক নীল পাখি মেলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত আনন্দ কলকাকলিতে মুখরিত করে তুলেছে। মেলার সৌন্দর্য ও আবেদনকে বাড়িয়ে দিতে এই পাখিগুলো কোথা থেকে এল? কেন এল? মেলাকে রাঙিয়ে দিতে আরো আগে আসেনি কেন ওরা? নবারুণের বন্ধুরা চল পরিচিত হই, মেলাকে প্রাণোচ্ছল করে তোলা এইসব মিষ্টি মিষ্টি, দুষ্টু দুষ্টু পাখিদের সঙ্গে।

সারি বেঁধে চলছে নীল পাখিরা, সঙ্গে আছে দলনেতা। ডানা মেলে ছুটে চলা এই পাখিরা এসেছে মোহাম্মদপুরের কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ থেকে। তবে অভিভাবকদের সঙ্গে নয়, তারা এসেছে স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

২৩ শে ফেব্রুয়ারি প্রায় দু'শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে অমর একুশে বইমেলায় হাজির হন কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. রহমত উল্লাহ্। উদ্দেশ্য কবি-লেখক ও নতুন বইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে বইমেলায় গমন এটিই প্রথম বলে আমার ধারণা। অনেক দূর-দূরান্ত থেকেও কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে শিক্ষার্থী নিয়ে আসতে দেখা গেলেও সেটা এরকম বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে নয়। তাই কিশলয়ের শিক্ষার্থীদের আগমনটা একটু ব্যতিক্রমী ও সবার নজর কাড়ার মতো একটি ঘটনা। তাদের বাধভাঙ্গা আনন্দ, উচ্ছ্বাস, হর্ষধ্বনি শুনে এবং একটু ক্ষণের জন্য হলেও থমকে দাঁড়িয়েছিল বইপ্রেমি ক্রেতা, দর্শক ও পাঠকরা। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে যখন দেখা হয়ে গেছে বিভিন্ন কবি-লেখকদের সঙ্গে তখন তারা হেসেছে পরম তৃপ্তির হাসি। আর যখন দেখা হয়েছে ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল স্যারের সঙ্গে তখন

যেন আনন্দ আর ধরে না। মনে হয়েছে তারা যেন এক অজানা পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে।

মেলায় আগত এইসব শিক্ষার্থীদের দেখে তাদের সাদরে বরণ করে নেন খ্যাতনামা লেখক মোজাম্মেল হক নিয়োগী। এই সময় এই ব্যতিক্রমী আয়োজনের ব্যাপারে তিনি বলেন, বইমেলায় আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হচ্ছে আজকের দিনটি। একসঙ্গে একই ব্যানারে এত শিক্ষার্থী পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আমি চাই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক অধ্যক্ষ রহমত উল্লাহ্‌র এই উদ্যোগ।

এক পর্যায়ে শিশু চত্বরে কিশলয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিলিত হন প্রখ্যাত লেখক ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। শিক্ষার্থীরা তাদের কেনা বইয়ের পাতায় তাঁর অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে এত সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বইমেলায় নিয়ে আসায় তিনি অধ্যক্ষকে সাধুবাদ জানান। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি কিছু সময় কাটান ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাদের একটি উপদেশ দেন, বলেন– 'তোমরা ভালো বই পড়'। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের প্রতিষ্ঠানে আমি যাব, তোমাদের সঙ্গে মন খুলে কথা বলব। আজ তোমাদেরকে আমি অটোগ্রাফ দিব না। তোমাদের প্রতিষ্ঠানে যেয়ে আমি তোমাদের সবাইকে অটোগ্রাফ দিব।

জাতীয় পর্যায়ে বেশ কয়েকবার পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুতোষ লেখক জনাব আহমেদ রিয়াজের সঙ্গেও শিক্ষার্থীরা আনন্দঘন সময় কাটায়।

এই শিক্ষার্থীরা এর আগে কখনো এরকম দলবদ্ধভাবে মেলায় আসেনি। তাই তাদের মধ্যে ছিল মুক্ত বিহঙ্গের উচ্ছলতা। তাদের পরনে ছিল নীল-সাদা ইউনিফর্ম, মাথায় ছিল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব স্লোগান শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ জাতি। ত্বরান্বিত অগ্রগতি লেখা ক্যাপ। এছাড়া তাদের কণ্ঠে ছিল বিভিন্ন ধরনের স্লোগান, যা একটু পরপরই মেলা প্রাঙ্গণকে প্রকম্পিত করছিল– 'ভালো বই পড়ব, ভালো জীবন গড়ব। লেখাপড়া ছাড়ব না, ভালো কাজে হারব না'। তারা প্রত্যেকে কমপক্ষে দুইশ টাকা করে নিয়ে এসেছিল বই কেনার জন্য। তারা কেউ কিনেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমার ছেলেবেলা, কেউ মুক্তিযুদ্ধের বই, কেউ বা কৌতুকের বই। কারো পছন্দ সায়েন্স ফিকশন, কারো গোয়েন্দা কাহিনী। বাদ যায়নি উপন্যাস, কবিতার বইও।

কিশলয় বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ রহমত উল্লাহ্‌ বালিকাদের যেমন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কবি-লেখকদের সঙ্গে তেমনি তাদের নতুন বইয়ের সঙ্গেও পরিচয় করাচ্ছিলেন বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে এবং সাহায্য করছিলেন বই কিনতে। সে সময় অধ্যক্ষ উপস্থিত সকলের উদ্দেশে বলেন, পাঠ্যবইয়ের বাইরেও যে একটা জগৎ আছে আমি শিক্ষার্থীদের সেটা চেনাতে চাই। এজন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানে সবসময়ই নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আর ব্যতিক্রম আয়োজন হিসেবেই আমি শিক্ষার্থীদের বইমেলায় নিয়ে এসেছি। শুধু শিক্ষার্থী নয়, সব শিক্ষকও এসেছেন।

তিনি আরো বলেন, কিছু শিক্ষার্থীর মা-বাবা তাদের সন্তানকে বইমেলায় নিয়ে যায়, বই কিনে দেয়। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীরই বইমেলায় যাওয়ার সুযোগ হয় না। তাই আমি সবাইকে বইমেলায় নিয়ে এসেছি। আমাদের এ আয়োজন দেখে অন্য প্রতিষ্ঠানও যদি তাদের শিক্ষার্থীদের মেলায় নিয়ে আসে তাহলে আমাদের এ উদ্যোগ সার্থক হবে।

নবারুণের বন্ধুরা তোমরা কি এবারের বইমেলায় গিয়েছিলে, কিনেছ নতুন কোনো পছন্দের বই? যদি কেউ কেউ এবার না গিয়ে থাক তাহলে সামনেরবার অবশ্যই যাবে কিন্তু। মা-বাবাকে আজকেই বলে রাখ।

# ঋতু পরিবর্তনে অসুখবিসুখ

**মো. জামাল উদ্দিন**

শীতের পর বসন্তের আগমন। ঋতু পরিবর্তনে বাতাসে এখন হালকা শীতের ছোঁয়া, সেই সঙ্গে হালকা গরম, কখনো আবার ঘামে ভিজে যাওয়া কিংবা ধুলোবালিতে মাখামাখি হওয়া। আর এসব কারণেই সাধারণত ঋতু পরিবর্তনের এ সময়টাতে শিশুদের জ্বর, সর্দি-কাশি, ডায়রিয়া এবং বদহজমে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা পড়ার সময় ফ্যান চালিয়ে লেখাপড়া করো। আবার রাতে ঘুমাতে গেলেও ফ্যান চালিয়ে রাখো। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে শেষ রাতে ফ্যানের বাতাসে তোমাদের ঠান্ডা লাগতে পারে। তাই এই সময় ফ্যান বন্ধ রাখতে হবে। নিয়মিত গোসল করবে এবং আরামদায়ক পোশাক পরবে।

শীত, গরম কিংবা বদলে যাওয়া আবহাওয়া যাই হোক, তোমাদের প্রতিদিন গোসল করতে হবে। তবে গরম পড়তে শুরু করেছে বলেই যে ঠান্ডা বা স্বাভাবিক পানি দিয়ে গোসল করবে তা নয়। তোমার যদি ঠান্ডার সমস্যা থাকে তাহলে হালকা কুসুম গরম পানিতে গোসল করবে।

এছাড়া এসময়ে ভাইরাসজনিত জ্বর, সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হলে বেশি করে আনারস ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মৌসুমী ফল খাবে। গবেষণায় দেখা যায়, আনারসের মধ্যে আছে এনজাইম, যা কাজ করে প্রদাহনাশক হিসেবে। এছাড়া ভিটামিন সি জাতীয় ফলমূলও সর্দি-কাশির জন্য উপকারী। তাছাড়া তুলসী পাতার রসের সাথে মধু মিশিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়। ডায়রিয়া থেকে রক্ষার জন্য তোমরা অবশ্যই ফুটানো পানি পান করবে।

মনে রাখবে বাইরের কেনা খাবার থেকে ফুড পয়েজনিং-এর আশঙ্কা অনেক বেশি। তাই এসব খাবার এড়িয়ে চলবে। এছাড়া ঋতু পরিবর্তনে অনেকের দেখা দিতে পারে চুলকানি, খোসপাঁচড়াসহ ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা। এসব রোগ থেকে রেহাই পেতে নিয়মিত গোসলের পাশাপাশি পড়তে হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক।

বন্ধুরা, এসময়ে খেতে পারো লাউ, করলা, কুমড়া, চিচিঙ্গা, পেঁপেসহ নানারকম সবজি। বাইরের খাবারের বদলে খেতে পারো মৌসুমী ফল। সরাসরি ফল খেতে ভালো না লাগলে জুস করেও ফল খেতে পারো। মনে রাখবে জীবনে সফল হতে হলে শরীরকে অবশ্যই সুস্থ রাখতে হবে।